মানবাধিকার বার্তা

thro.org.in

মে ২০২৬ প্রথম সংখ্যা

ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশনের মুখপত্র "মানবাধিকার বার্তা" । "মানবাধিকার বার্তা" প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে টি এইচ আর ওর ষষ্ঠ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির প্রথম সভায়। অনলাইন সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বিবিধ সমস্যা আছে। খরচ সংকুলনের প্রশ্ন এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। তাই অনলাইন সংস্করণ।

মানবাধিকার লঙঘনের বিভিন্ন ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করা, মানবাধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি করা, রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষের সাহসী প্রতিরোধ ও লড়াই ইত্যাদি তুলে ধরাই মানবাধিকার বার্তার মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্তমানে সারাদেশ এক ভয়াবহ সংকটের মধ্যে । আমাদের রাজ্যের মানবাধিকার পরিস্থিতি গুরুতর বললেও কম বলা হয়। দেশের বাকি অংশের অবস্থান তথৈবচ। বাক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার ভয়াবহভাবে আক্রান্ত। যারাই শাসকদের বিরুদ্ধে মুখ খুলবেন, স্বাধীন মত প্রকাশ করার সাহস দেখাবেন, তাদের উপরই নেমে আসে রাষ্ট্রীয় দমন পীড়ন, একের পর এক মিথ্যা মামলা, কালাকানুন প্রয়োগ।

এপ্রিল মাসে নয়ডা সহ বৃহত্তর রাজধানী অঞ্চলের আধঘন্টা আটঘন্টা কাজ ও ন্যায্য মজুরির দাবিতে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের উপর ভয়াবহ দমন পীড়নে আবারো প্রকটিত ভয়ানক ভাবে বিপন্ন মানবাধিকার পরিস্থিতি। বিচারের প্রয়োজন নেই। অভিযোগ প্রমাণের দায় নেই। তদন্ত করার হ্যাপা নেই। চার্জশিট দেওয়ার দরকার নেই। অভিযোগ উঠলেই অভিযুক্তের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দাও। অভিযুক্তকে এনকাউন্টার করে শেষ করে দাও। এটাই এখন রাজ্যে রাজ্যে রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারত এখন বুলডোজার যুগে প্রবেশ করেছে। বুলডোজার বাবাদের রমরমা। গরিব, প্রান্তিক ও সংখ্যালঘু মানুষদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। বিনা নোটিসে পায়ের তলার মাটি ও মাথার উপর ছাউনি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে নিষ্ঠুর ভাবে। একই মহা আখ্যান দেশ জুড়ে বিরাজ করবে। প্রতিটি নাগরিক এক একজন অনুপ্রবেশকারী। একেক জন সন্দেহভাজন দেশদ্রোহী। প্রত্যেকটি নাগরিককে প্রতিমুহূর্তে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। ভোটার তালিকা থেকে কোটি কোটি ভারতীয়কে বাদ দেওয়া হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ, ধর্মীয় বিদ্বেষ ধর্মীয় বিভাজনকে তীব্র করতে সদা সচেষ্ট অন্ধকারের শক্তি, ফ্যাসিবাদী শক্তি। প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের সমস্ত স্তম্ভগুলো এখন ব্যর্থ পরিহাস ছাড়া কিছুই নয়। বৃহৎ গণমাধ্যম সরকারকে

প্রশ্ন করেনা। নির্বাচন কমিশনের প্রধান এজেন্ডা নাগরিকদের ভোটাধিকার হরণ। একের পর এক আইন বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভায় পাস করানো হচ্ছে। সেই আইনগুলোর লক্ষ্য তথাকথিত লাভ জিহাদ মোকাবেলা। আসল লক্ষ্য হলো, নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতায় নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ। কোন নাগরিক কাকে বিয়ে করবে, কালকে পছন্দ করবে, কি খাবে, কি পড়বে, কি গাইবে, তা ঠিক করে দেবে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র পোষিত বিভিন্ন অ-রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো। রাষ্ট্র নির্মিত মহা আখ্যান সবাইকে গিলতে হবে । এর বিরুদ্ধে কথা বললেই নেমে আসবে আঘাত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ আদালত নাগরিক অধিকার রক্ষায় ও সংবিধান রক্ষায় দায়িত্ব পালন করছে না। করতে পারছে না।

১৯৭৫- ৭৭ সনে আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার সময় সুপ্রিম কোর্ট জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এডিএম জব্বলপুর বনাম শ্রীকান্ত শুক্লা মামলা। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুপ্রিম কোর্ট একইভাবে দায়িত্ব পালন করছে না নাগরিকদের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে। এরকম একটি কঠিন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মানবাধিকার আন্দোলন সারা দেশেই অসম যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। দুর্বৃত্তদের আপত প্রতিকারহীন পরাভবের বিরুদ্ধে মানবাধিকারের লড়াই জারি আছে, জারি থাকবে। টি এইচ আরও এই রাজ্যে দুই দশক ধরে মানবাধিকার আন্দোলনে সক্রিয়। ২০১৮ এর পরবর্তী প্রতিকূল পরিবেশেও টি এইচ আর ও দায়িত্ব থেকে সরে আসেনি।

মানবাধিকার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য মুখপত্র প্রয়োজন। মানবাধিকার আন্দোলনকে সবার কাছে নিয়ে যাওয়ার কাজ করবে মানবাধিকার বার্তা। শাসকের প্রতিটি দুর্বৃত্তপনাকে ও দুরাচারকে ভাবীকালের জন্য সংরক্ষিত করে রাখবে মানবাধিকার বার্তা। এই কাজটা করার প্রতিজ্ঞা নিয়েই মানবাধিকার বার্তার অনলাইন সংস্করণ। বছরে একবার বিশেষ মুদ্রিত সংস্করণ করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। মানবাধিকার বার্তায় উঠে আসুক সাধারণ মানুষের সমস্যা। দৈনন্দিন জীবনযাপনের যন্ত্রণা। যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ খোঁজার প্রয়াস। মানবাধিকার লঙঘনের প্রতিটি ঘটনার বিরুদ্ধে সুবিচারের জন্য প্রয়াসের বিবরণীতে ভরে উঠুক মানবাধিকার বার্তার প্রতিটি পাতা। সবার সহযোগিতার কাম্য মানবাধিকার বার্তাকে নিয়মিত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এবং সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

সূচিপত্র

১. প্রাপ্তবয়স্ক সার্বজনীন ভোটাধিকারের অন্তর্জলী যাত্রা - পুরুষোত্তম রায় বর্মন

২. ভারতে মানবাধিকার: আইন, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ - ড: প্রশান্ত চক্রবর্তী

৩. নারীর ক্ষমতায়ন ও বাস্তবতা - অলকানন্দা চৌধুরী

৪. প্রতি আটচল্লিশ ঘণ্টায় এ দেশে পুলিশ হেফাজতে একটি মৃত্যু
(ত্রিপুরা দর্পণের পাতা থেকে)

৫. দ্বি- মত মানেই সন্ত্রাস? - তীর্থরাজ ধর

৬. মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনায় টি এইচ আর ওর প্রতিবাদ : চুম্বক উপস্থাপনা - মনিময় রায়

৭. তোরা যুদ্ধ করে করবি কি তা বল! - মিহিরলাল রায়

৮. উমর খালিদ ও সার্জিল ইমামের নিঃশর্ত মুক্তি চাই

৯. সুপ্রিম কোর্টের রায় বৃহত্তর বেঞ্চে পুনর্বিবেচনা করতে হবে - নিজস্ব প্রতিবেদন

১০. অস্বাভাবিককে "স্বাভাবিক" করার প্রেক্ষাপটে হাজত হত্যার দায়ে নয় পুলিশ কর্মীর ব্যতিক্রমী সাজা - বিবেক রায়

১১. রাষ্ট্রের ছাড়পত্র ছাড়া পরিচয় নেই: ট্রান্সজেন্ডার সংশোধনী আইন ২০২৬ এবং অধিকারের অবক্ষয় - নিজস্ব প্রতিবেদন

১২. রক্তচক্ষু

প্রাপ্তবয়স্ক সার্বজনীন ভোটাধিকারের অন্তর্জলী যাত্রা
- পুরুষোত্তম রায় বর্মন

প্রাপ্তবয়স্ক সার্বজনীন ভোটাধিকার বা Universal Adult Franchise দারুণভাবে আক্রান্ত। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এস আই আরের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন কয়েক কোটি ভারতীয়ের ভোটাধিকার ইতিমধ্যে কেড়ে নিয়েছে। কেরল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদেশে এস আই আর সম্পন্ন হয়ে গেছে। এস আই আরের মাধ্যমে কতজন বিদেশিকে খুঁজে পাওয়া গেছে এই তথ্য প্রকাশ্যে আনার সাহস এখনো অব্দি নির্বাচন কমিশনের হয়নি। সবগুলো রাজ্য মিলিয়ে ১০০ জন বিদেশিকেও এখনো অব্দি খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু কয়েক কোটি ভারতীয়কে ভোটাধিকারহীন নাগরিকে পরিণত করা গেছে এস আই আর বা সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মাধ্যমে। ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রাপ্তবয়স্ক সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সমস্ত নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সাংবিধানিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। নির্বাচন কমিশনের মূল লক্ষ্য অবশ্যই যাতে একজন নাগরিকও ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করা । স্বাধীনতার পর নির্বাচন কমিশন এই কাজটা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছিল এবং সফলও হয়েছিল। প্রত্যেকটি নাগরিকের কাছে নির্বাচন কমিশন পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে যাতে করে ভোটার তালিকা পূর্ণাঙ্গ হয়, কেউ বাদ না যায়।

বর্তমানে জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে ভারতের নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ বিপরীত পথে হাঁটছে। নির্বাচন কমিশন ধরে নিয়েছে, প্রত্যেকটি ভোটার এক এক জন সম্ভাব্য বিদেশি অনুপ্রবেশকারী। এবং প্রত্যেক ভোটারের উপর বিদেশি অনুপ্রবেশকারী নয় সেটা প্রমাণ করার দায়িত্ব পড়েছে। এই প্রমাণের মাপকাঠিগুলো এমনভাবে নির্ধারিত করা হয়েছে যা অধিকাংশ ভোটারের সাধ্যের বাইরে ও আওতা বহির্ভূত। নিজেদের নাম ভোটার তালিকায় রাখার জন্য ভোটারদের লাঞ্ছনা, যন্ত্রনা, হয়রানী ও দুর্গতি সীমাহীন।

জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ অনুযায়ী প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে ভোটার তালিকার সংশোধন হয়। উপ-নির্বাচনের পূর্বেও ভোটার তালিকার সংশোধন হয় এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী যে-কোনো বছর ভোটার তালিকার সংশোধন করা যায়। এছাড়াও কারণ লিপিবদ্ধ করে নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন করতে পারে।

ভোটার তালিকা নিবন্ধন বিধি অনুযায়ী ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্ষিপ্ত হতে পারে অথবা নিবিড় হতে পারে এবং নির্বাচনের পূর্বে ভোটার তালিকার সংক্ষিপ্ত সংশোধন হয় এবং নির্বাচন নয় এমন কোন বছরে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনও হতে পারে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের কোনো আইনি ভিত্তি

বা বৈধতা নেই। নির্বাচন কমিশনের সমস্ত ক্ষমতার উৎস সংবিধানের ৩২৪ ধারা এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ ও এই আইনের অধীনে প্রণীত বিভিন্ন রুলস। এবার বিহার, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচন কমিশন যে এস আই আর করলো তা অবশ্যই অবৈধ ও অসাংবিধানিক।

যে বছর নির্বাচন নেই সেই বছরই শুধুমাত্র ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন করা যায়। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের বিধান আইনে নেই। কিন্তু যা আইনে নেই তাই করা হয়েছে। যে ক্ষমতা সংবিধান ও আইন দেয়নি সেই ক্ষমতাই প্রয়োগ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন নাগরিকত্ব যাচাইয়ের বুলডোজার অভিযানে নেমেছে। সংবিধানের ৩২৬ ধারা অনুযায়ী, প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি ভারতের নাগরিক এবং যার বয়স ১৮ র কম নয় এবং যিনি সংবিধান ও আইন অনুযায়ী ভোটার হওয়ার জন্য অযোগ্য বিবেচিত হননি, তিনি ভোটার হিসেবে নিজের নাম নিবন্ধন করতে পারবেন। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষ অন্তর্ভুক্তিমূলক নাগরিকত্বের ধারণাকে গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপি ভারতবর্ষে বসবাসকারী প্রত্যেকটি ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক হিসেবেই বিবেচিত ও গণ্য হবেন এবং যদি কেউ কোন ব্যক্তির নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে সেই ক্ষেত্রে প্রমাণের দায়িত্ব অভিযোগকারীর, অভিযুক্ত মানুষটির নয় । নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী নাগরিকত্বের বিষয় গৃহমন্ত্রকের এখতিয়ারভুক্ত। গৃহমন্ত্রকই একমাত্র বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলতে পারে, ভারতীয় প্রমাণের জন্য কোন কোন দলিল বা ডকুমেন্ট গ্রহণযোগ্য। এখনো অব্দি গৃহমন্ত্রক এই বিষয়ে কোন বিবৃতি দিয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। নির্বাচন কমিশন গৃহ মন্ত্রকের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে।

বিহারের এস আই আর সময়কালে নির্বাচন কমিশন কতগুলো দলিল নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য। সাধারণ নাগরিকদের কাছে যে দলিলগুলো বা প্রমাণগুলো সহজলভ্য সেগুলো দিয়ে নাগরিকত্ব যাচাই করা বা প্রমাণ করা যাবে না। আধার কার্ড রেশন কার্ড বা নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত সচিত্র পরিচয় পত্র সবই অপাংক্তেয় । এগুলো কোন প্রমাণই নয়। গরিব, প্রান্তিক, সংখ্যালঘু ও নারীদের গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে আসতে হবে নিজেদের ভারতীয় প্রমাণ করার জন্য এবং ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য। নির্বাচন কমিশন কোথা থেকে এই দায়িত্ব পেল। প্রমাণ কর, একবার নয় বারবার তোমাকে প্রমাণ করতে হবে তুমি ভারতীয়।

সংবিধানের ৩২৪ ধারায় কি নির্বাচন কমিশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, কোন কোন দলিলের ভিত্তিতে একজন ভোটার ভারতীয় নাগরিক কিনা তা নির্ধারিত করার ?

অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এস আই আর স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে।ভোটার তালিকার নিবন্ধন বিধি ১৯৬০ এ বলা হয়েছে কিভাবে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। এনুমারেশন ফরম পূরণ করতে হবে । কোন বাড়ির মালিক তার সামর্থ্য অনুযায়ী যে তথ্য দেবেন সেটা নির্বাচন কমিশনকে গ্রহণ করে মেনে নিতে হবে। নির্বাচন কমিশন এমন কোন তথ্য চাইতে পারেন না যা ভোটারদের পক্ষে জোগাড় করার সাধারণ ভাবে সম্ভব নয়। নির্বাচন কমিশন এই কাজটাই যে সমস্ত রাজ্যে এস আই আর হয়েছে সেখানে করেছে দারুন আক্রোশে ও ক্ষমতার মদমত্ততায় । নির্বাচন কমিশন যে সমস্ত নথির দাবী করেছেন সেই সমস্ত নথি দেওয়ার পরেও তথাকথিত যৌক্তিক অসঙ্গতি বা লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেনসির হাড়িকাঠে লক্ষ লক্ষ ভোটারদের বলি দেওয়া হয়েছে । বিয়ের পর স্বামীর পদবী গ্রহণ করার রেওয়াজ দীর্ঘদিন ধরেই এদেশের চলে আসছে। কোন ভোটারের নাম ধরা যাক অনিমা সেন। বিয়ের পর স্বামীর পদবী জুড়ে অনিমা সেন হলেন অনিমা সেন রায়। এখন সেই ভোটারকে পেশ করতে হবে অনিমা সেন থেকে অনিমা সেন রায় হওয়ার যৌক্তিক ব্যাখ্যা। নামের বানান বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন রকম হতেই পারে। সমস্ত নথিপত্র থাকা সত্বেও লক্ষ লক্ষ নাগরিক এই কারণেই বে-ভোটার হয়ে গেছে।

এস আই আর কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে অনেকগুলো মামলা চলছে। কয়েক কোটি ভারতীয় নাগরিককে ভোটাধিকারহীন করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট দিনের পর দিন এস আই আর প্রক্রিয়ার বৈধতা যাচাই করার বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন। তথাকথিত যৌক্তিক অসঙ্গতির কারণে বাদ পড়া ভোটারদের বিষয়টি নিষ্পত্তি না করে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন হয়ে গেল। সুপ্রিম কোর্ট ২৭ টি ট্রাইবুনাল গঠন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই ট্রাইব্যুনাল গুলোর কাজ হবে বাদ পড়া ভোটারদের আবেদনের নিষ্পত্তি করা। এই আবেদনগুলোর নিষ্পত্তি না করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে যাওয়াই তো অসাংবিধানিক ও বেআইনি। একটি ট্রাইব্যুনালও এখনো অব্দি কাজ শুরু করতে পারেনি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন হয়ে গেছে। ৯১ লক্ষ ভোটারের ভোটাধিকার ডাকাতরা কেড়ে নিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট নিরব। শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্ট বলছে SIR is an inevitable process. এস আই আর হবেই। এসআই আরের বৈধতা যখন সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন তখন কিভাবে এ ধরনের মন্তব্য করা যায়। কিসের তাড়া । কেন এত তড়িঘড়ি করে এস আই আর করতেই হবে। তাহলে কি এসআইআর এর পূর্বে অনুষ্ঠিত সবগুলো নির্বাচন অবৈধ ছিল। এখন অব্দি সুপ্রিম কোর্ট এস আই এর মামলায় যে সমস্ত আদেশ দিয়েছে সেগুলো তো প্রশাসনের দেওয়ার কথা। সুপ্রিমকোর্টের কাজ তো বিচার করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া। এস আই আর এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা মামলা গুলোর নিষ্পত্তি করা। আধার কার্ড বিবেচনার জন্য ই সি আই কে অনুরোধই কি সুপ্রিম কোর্টের দায়িত্বের শুরু

ও শেষ। একবার ভোট না দিতে পারলেও কিছু হবে না, এরকম মন্তব্য মহামান্য বিচারপতিদের কাছ থেকে শোনা গেছে। যদি একজন বৈধ ভোটারকেও বেআইনিভাবে বাদ দিয়ে নির্বাচন করানো হয় সে তবে সেই নির্বাচন অবৈধ। লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারকে বাদ দিয়ে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের সবুজ সংকেত দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের ব্যর্থতা ও অনীহা নয় কি? অদ্ভুত সময়ে দাঁড়িয়ে । অদ্ভুত পরিস্থিতি। সংসদীয় গণতন্ত্রকে বোতল বন্দী করা হচ্ছে। প্রাপ্তবয়স্ক সার্বজনীন ভোটাধিকারকে নির্মমভাবে ছাঁটাই করা হচ্ছে। বেছে বেছে সংখ্যালঘুদের এস আই আর এর মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া। আদিবাসী, সংখ্যালঘু, পরিযায়ী শ্রমিক ও নারীদের ভোটার তালিকা থেকে ঝেড়ে ফেলা হচ্ছে। যৌক্তিক অসংগতির প্রশ্নে বিবেচনাধীন লক্ষ লক্ষ ভোটারের বিষয়টি বিবেচনা না করেই, নিষ্পত্তি না করে তাদেরকে বাদ দিয়ে নির্বাচন। আর নির্বাচনে সুপ্রিম কোর্ট মামলা শুনছেই শুনছে। নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারিতায় কোন অঙ্কুশ নেই।

নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বা এক্তিয়ার অবাধ বা নিয়ন্ত্রণহীন হতে পারে না। সংবিধানের ৩২৪ ধারা নির্বাচন কমিশনকে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার ক্ষমতা প্রদান করেছে। ভোটার তালিকা প্রস্তুতির বিষয়ে আইন আইন সভা রচনা করেছে। জন প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০। তাই নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই আইন সভা প্রণীত আইনের চৌহদ্দীর মধ্যে থেকে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। কোন বিষয়ে যদি আইন নীরব তবেই সেই নির্দিষ্ট বিষয়েই নির্বাচন কমিশন সংবিধানের ৩২৪ ধারায় উপর নির্ভর করতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ মহিন্দ্রর সিং গ্রিল বনাম মুখ্য নির্বাচন কমিশন মামলায় ১৯৭৭ সনে প্রদত্ত রায়ে স্পষ্ট ভাবে বলেছে, নির্বাচন কমিশনকে আইনের লক্ষণ রেখার মধ্যে থাকতে হবে।

এস আই আর এর বৈধতা বিচার করা সুপ্রিম কোর্টের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার অন্তর্গত। এই দায়িত্ব পালন না করে সুপ্রিম কোর্ট এস আই আর প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটির মধ্যে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছে। যার ফলে এস আই আর শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনের সন্তান থাকছে না, সুপ্রিম কোর্ট যেন ঐ সন্তানের দত্তক পিতা হয়ে পড়ছে ক্রমে ক্রমে। মূল দায়িত্ব দ্রুততার সাথে পালন না করে সুপ্রিম কোর্ট যেন মধ্যস্থতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে। বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যে গ্রহণযোগ্য পন্থা উদ্ভাবন করে এস আই আরকে সুষ্ঠ করতে চাইছে। প্রক্রিয়াকে ন্যায় সঙ্গত করাটা সুপ্রিম কোর্টের মূল কাজ নয় । মূল দায়িত্বে হচ্ছে বিচার্য বিষয়টির নিষ্পত্তি করা। বিচার্য বিষয়টি গুরুত্ব অপরিসীম। কোটি কোটি নাগরিকের ভোটাধিকার নির্ভর করবে বিচার্য বিষয়ের সঠিক সংবিধান সম্মত ফয়সালার উপর। সুপ্রিম কোর্ট কোটি কোটি নাগরিকের ভোটাধিকার হরণকে স্বাভাবিকতার জামা পড়িয়ে দিতে পরোক্ষে সাহায্য করছে। সুপ্রিম কোর্ট দায়িত্ব এড়ানোর, সাংবিধানিক অনীহার বিপদজনক নজীর সৃষ্টি করছে।

একই আখ্যান সর্বত্র বিরাজ করছে। সবাই বিদেশি। প্রত্যেকটি নাগরিক এক একজন সন্দেহ ভাজন বিদেশি, ঘুসপেটিয়া। প্রত্যেকটি নাগরিককে বারবার নাগরিকত্বের অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। শাসকরা ঠিক করবেন তাদের নির্বাচকমণ্ডলী কারা হবে। নির্বাচক মন্ডলীর শাসকদের নির্বাচিত করার দিন শেষ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। শাসকরা নির্বাচক মন্ডলীকে নির্বাচিত করবে এস আই আর এর বদান্যতায়, নির্বাচন কমিশনের সাহায্যে। সুপ্রিম কোর্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে, শুনবে। বলা হবে একবার ভোট না দিলে তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। বাহবা সময় তো সার্কাস খেলা।

"একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষ আমাকে বলিয়াছিলেন: 'তোমরা প্রায়ই বল, পুলিশ তোমাদের' পরে অত্যাচার করে, আমিও তা অবিশ্বাস করিনা। কিন্তু তোমরা-তো তার প্রমাণ দেওনা।

কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই সে-তো গায়ের জোরে নয়, সেতো তেজের লড়াই, সে তেজ কর্তব্য বুদ্ধির। দেশকে নিরন্তর পীড়ন হইতে বাঁচাইবার জন্য একদল লোকের-তো বুকের পাটা থাকা চাই, অন্যায়কে তারা প্রান পণে প্রমাণ করিবে, পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিবে। জানি পুলিশের একজন চৌকিদারও একজন মানুষ মাত্র নয়, সে একটা প্রকান্ডশক্তি। একটি পুলিশ পেয়াদাকে বাঁচাইবার জন্য মকদ্দমায় গর্ভমেন্টের হাজার-হাজার টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ, আদালত মহা সমুদ্র পার হইবার বেলায় পেয়াদার জন্য সরকারী স্টিমার, আর গরীব ফরিয়াদিকে তুফানে সাঁতার দিয়া পার হইতে হইবে, একখানা কলার ভেলাও নাই।"

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতে মানবাধিকার: আইন, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ

- ড: প্রশান্ত চক্রবর্তী

মানবাধিকার মানে মানুষ হিসেবে আমাদের জন্মগত অধিকার যা আমরা কেবল মানুষ বলেই পাই । জাতিসংঘ –এর সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র আমাদের জানায়, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মায় । জীবন, স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার শুধু আইনের বিষয় নয়, এগুলো আমাদের অস্তিত্বেরই অংশ । দার্শনিক James Nickel মানবাধিকারকে মানুষের ওপর হওয়া গুরুতর অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ঢাল হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

এই ধারণাকে ভিত্তি করেই ভারতে মানবাধিকার সুরক্ষা একটি মৌলিক সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । সংবিধানের তৃতীয় ভাগে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে, যা লঙ্ঘিত হলে তারা ভারতের সুপ্রিমকোর্ট এর কাছে সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদের মাধ্যমে প্রতিকার চাইতে পারেন । ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদ আদালতকে এমন আইন বাতিল করার ক্ষমতা দেয় যা এই অধিকারগুলোর বিরুদ্ধে যায়, ফলে আদালত এই অধিকারগুলোর প্রধানরক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত । ৩২(৩) নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইন সভা অন্য আদালতকেও এই অধিকার কার্যকর করার দায়িত্ব দিতে পারে।

এই লক্ষ্য পূরণের জন্য মানবাধিকার সুরক্ষা আইন, ১৯৯৩ প্রণয়ন করা হয় । এই আইনে মানবাধিকারকে জীবন, স্বাধীনতা, সমতা ও মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত অধিকার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (NHRC), রাজ্য মানবাধিকার কমিশন (SHRC) ও মানবাধিকার আদালত (HRC) গঠনের কথা বলা হয়েছে, যাতে অধিকার রক্ষা আরও কার্যকরহয়।

বিচার বিভাগও এইক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সুপ্রিম কোর্ট তার প্রগতিশীল ব্যাখ্যার মাধ্যমে মৌলিক অধিকারগুলোর পরিধি বাড়িয়েছে, ফলে এগুলো সাধারণ মানুষের কাছে আরও অর্থবহ হয়েছে। তবে বাস্তবতার চিত্র এতটা সরল নয় । এই অধিকারগুলো টিকিয়ে রাখতে হলে প্রয়োজন শক্তিশালী রাষ্ট্র, ন্যায্য আইন এবং মানবিক প্রশাসন । শিক্ষাবিদ Monisha Bajaj তাই মানবাধিকার শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেন, কারণ সচেতনতা থেকেই পরিবর্তনের শুরু।

বাস্তবে দেখা যায়, আইন থাকা সত্ত্বেও তার প্রয়োগ সব সময় সমানভাবে হয় না । সামাজিক বৈষম্য, প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অনেক সময় মানুষের

অধিকারকে সীমিত করে দেয়। গত কয়েক দশকে এমন বহু ঘটনা ঘটেছে, যেখানে মৌলিক অধিকার প্রশ্নের মুখে পড়েছে —কখনও পুলিশের গুলিতে প্রাণহানি, কখনও আইনের অপব্যবহার।

কোভিড-১৯ মহামারীর সময় ২০২০ সালের ২৪ মার্চ ভারত সরকার দেশ জুড়ে লক ডাউন ঘোষণা করে, যার ফলে ভ্রমণ ও জন সমাগমে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। এই সিদ্ধান্ত ভাইরাসের বিস্তার রোধে গুরুত্ব পূর্ণ হলেও, পরিযায়ী শ্রমিকদের মতো সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কথা যথেষ্ট ভাবে বিবেচনা করা হয়নি। কাজ ও আয় হারিয়ে তারা হঠাৎই অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায়। পরিবহন বন্ধ থাকায় অনেকেই নিজের বাড়িতে ফিরতে পারেননি। বাধ্য হয়ে অসংখ্য শ্রমিক পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেন, আর এই পথে ক্লান্তি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অনেকেই প্রাণ হারান। এই ঘটনা গুলো দেখায়, সংকটের সময়ে পরিকল্পনার ঘাটতির কারণে কীভাবে প্রান্তিক মানুষের মানবাধিকার মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

কর্তৃপক্ষের দমনমূলক নীতির কারণে দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি দেখা যায়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যবহার করায় সাংবাদিক, কৌতুকশিল্পী, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ বা সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়। সামাজিক মাধ্যমে ভিন্নমত দমনের চাপও বাড়ে এবং শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের অনেকক্ষেত্রে আটক করা হয়। কিছু অধিকার কর্মী ও ব্যক্তিত্ব—যেমন Umar Khalid—দীর্ঘ দিন ধরে কারাগারে বন্দি থাকেন।

একই সময়ে ধর্মীয় ও জাতি গত সংখ্যালঘুরা ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে পড়েন। বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগ ওঠে—বিয়ে সংক্রান্ত কিছু আইন এবং উচ্ছেদ অভিযানের ফলে অনেক মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েন। Assam-এ জোর পূর্বক উচ্ছেদ, মহারাষ্ট্র এবং জম্মুওকাশ্মীর –এ ঘর বাড়ি ভেঙে দেওয়ার ঘটনাও উদ্বেগ বাড়ায়। এছাড়া রোহিঙ্গা ও বাঙালি বংশোদ্ভূত কিছু মুসলমানকে দেশছাড়া করার অভিযোগও উঠে।

পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পর্কিত ক্ষেত্রে ওউদ্বেগ রয়েছে। নীতিমালার পরিবর্তনে আদিবাসীদের সুরক্ষা কমে গেছে, ফলে তাদের বাস্তুচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা বেড়েছে। অন্যদিকে বন্যা, ভূমিধস ও তাপপ্রবাহে প্রাণ হানি চলছেই, যা জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় পর্যাপ্ত উদ্যোগের অভাবকে স্পষ্ট করে। পাশাপাশি দলিতদের ওপর জাত ভিত্তিক সহিংসতাও এখনও একটি বড় সমস্যা হয়ে রয়ে গেছে।

বিশেষকরে Unlawful Activities (Prevention) Act-এর মতো আইনের প্রয়োগে Umar Khalid বা Stan Swamy-এর মতো ব্যক্তিদের দীর্ঘদিন বিচার ছাড়াই আটক থাকার ঘটনা ন্যায় বিচার নিয়ে প্রশ্ন তোলে। ২০২৫ সালে Sonam Wangchuk-কে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে আটক

করার ঘটনা আরও প্রশ্ন তোলে—শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কি অপরাধ? আইনজীবী Mihir Desai মনে করেন, এমন আইন কখনও কখনও ভিন্ন মত দমনের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

নাগরিকত্বের ক্ষেত্রেও উদ্বেগ বেড়েছে। National Register of Citizens-এর প্রক্রিয়ায় অনেক মানুষ নিজেদের পরিচয় প্রমাণ করতে না পেরে অনিশ্চয়তায় পড়েছেন। আবার তথাকথিত "লাভজিহাদ" সংক্রান্ত কিছু আইন ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ও সংকোচ দেখা যায় —জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় Controversy 2016 - এর মতো ঘটনা ভিন্ন মতপ্রকাশের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে।

একই ভাবে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়াতেও অনেকের ভোটাধিকার হারানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটেই সাম্প্রতিক 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' (SIR) প্রক্রিয়া নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ভোটার তালিকা সংশোধন এর উদ্দেশ্যে চালু হলেও, এটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে সমালোচিত হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও অভিবাসী শ্রমিকদের পদ্ধতিগত ভাবে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। অনেক সমালোচকের মতে, এই প্রক্রিয়াটি কার্যত National Register of Citizens-এর একটি "নেপথ্যসংস্করণ" হিসেবে কাজ করছে, যেখানে যাচাইয়ের নামে ভোটার তালিকা থেকে ব্যাপক ভাবে নামবাদ দেওয়া হচ্ছে।

এই প্রক্রিয়া নিয়ে কয়েকটি গুরুতর উদ্বেগ সামনে এসেছে। প্রথমত, বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ার অভিযোগ রয়েছে—অনেক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নোটিশ ছাড়াই, যা ভোটাধিকারের লঙ্ঘন। দ্বিতীয়ত, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, অভিবাসী শ্রমিক ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা এতে তুলনা মূলকভাবে বেশি ক্ষতি গ্রস্ত হচ্ছেন। তৃতীয়ত, মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ তৈরি হচ্ছে, যা মানবিক দিক থেকেও উদ্বেগ জনক। চতুর্থত, অতিরিক্ত নথিপত্রের চাহিদা অনেক বৈধ ভোটারের জন্যও বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এই বিষয় গুলো নিয়ে ভারতের সুপ্রিমকোর্ট একাধিক আবেদন জমা পড়েছে, যেখানে প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং একটি স্বাধীন নিরীক্ষার দাবি উঠেছে। অনেক বিশ্লেষক এই প্রক্রিয়া কে নিরপেক্ষ প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবে না দেখে বরং "আমলাতান্ত্রিক সহিংসতার" একটি রূপ হিসেবেও ব্যাখ্যা করেছেন।

এর পাশাপাশি, আইনের বাস্তবায়নেও ঘাটতি রয়েছে। অনেক রাজ্যে এখনও মানবাধিকারক মিশন ও জেলা মানবাধিকার আদালত পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি, যদিও আইনতা বাধ্যতামূলক করেছে। সুপ্রিমকোর্ট বারবার নির্দেশ দিলেও বাস্তব অগ্রগতি সীমিত। আবার

মানবাধিকার আদালত গুলোর ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতি স্পষ্ট না হওয়ায় তাদের কার্যকারিতাও কমে যায়।

সবমিলিয়ে, ভারতের মানবাধিকার কাঠামো এক দিকে শক্তিশালী ও প্রগতিশীল, অন্যদিকে বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতায় আক্রান্ত। আইন ও বাস্তবতার এইফারাক কমাতে হলে প্রয়োজন কার্যকর প্রয়োগ, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি নাগরিক সচেতনতা ও জবাবদিহিতা।

শেষ পর্যন্ত বলা যায়, মানবাধিকার শুধু সংবিধানের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবেনা—এগুলো কে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বাস্তব অর্থে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর সেই দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সমাজ—উভয়েরই।

নারীর ক্ষমতায়ন ও বাস্তবতা

- অলকানন্দা চৌধুরী

নারীর ক্ষমতায়ন শব্দটি বহুল চর্চিত কিন্তু বাস্তবে সেটি কতদূর কার্যকরী হয়েছে সে বিচার করতে গেলে হতাশার ছায়া ঘনিয়ে আসে সন্দেহ নেই। ক্ষমতায়নের সার্বিক সাফল্যের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা একটি একটি জরুরি বিষয়। এটা কারো অজানা নয় । কিন্তু এই স্বাধীনতা কে সফল করার জন্য কোন পদক্ষেপ সবচেয়ে জরুরি তার সমাধান আজও হয় নি। আর সে কারণেই মহিলারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে ও আর্থিক সচ্ছলতার ভাগীদার হতে পারেন না। বরং বিনা মজুরির দিনমজুর হয়ে ই তাদের থাকতে হয়। হ্যাঁ, পারিবারিক ক্ষেত্রে মেয়েদের শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন আজ ও হয় নি। অদূর ভবিষ্যতেও হবে বলে আশা করা যাচ্ছে না। নানা রকম গবেষণার বিশ্লেষণে এইসব শ্রমজীবি মহিলাদের নামকরণ হয়েছে 'আনপেড ফ্যামিলি লেবার'। এদের শ্র মের মূল্য যথাযথ হোক এবং সেটা তাদের ই হাতে যাক এই ভাবনার বাস্তবায়ন ভিন্ন নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন অসম্ভব।

আমাদের দেশে মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে যোগদানের হার অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বেশ কম। লেবার ফোর্স পারটিসিপেশন রেট বা শ্রমশক্তি তে যোগদানের হারের মধ্যে দেশের আর্থিক অবস্থার চিত্রটি প্রতিফলিত হয়। ভারতে ২০২১-২২সালের সমীক্ষায় কর্মক্ষম পুরুষ ও নারীর শ্রম শক্তিতে যোগদানের ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবধান রয়েছে যা অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ভারতের জনসংখ্যা গত সুবিধা যে টুকু রয়েছে তা অব্যবহৃত থাকার কারণে একেবারেই হারিয়ে যাবে যদি মহিলা দের শ্রম শক্তিতে যোগদানের হার না বাড়ে। একই নিরাশা ব্যঞ্জক চিত্র আমাদের নজরে আসে সারা পৃথিবীর সামগ্রিক নারী উন্নয়নের সার্বিক দিক টির প্রতি লক্ষ্য করলে। গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স ২০২৪ এর সমীক্ষা অনুযায়ী প্রমাণিত যে আগামী ১০০ বছরেও বিশ্বে মেয়েরা শিক্ষা, কর্ম, নিযুক্তি, স্বাস্থ্য এবং রাজনৈতিক সক্ষমতায় পুরুষের সমান হতে পারবে না। বৈষম্য কমছে ঠিকই কিন্তু তার গতি জানিয়ে দেয় আগামী দিনে ১৩৪ বছর পর হয়তো আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমতা আসতে পারে। একবিংশ শতকের গোড়ায় সু স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরুষ-মহিলা বৈষম্য হ্রাসকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০৩০ সালকে লক্ষ্যবর্ষ হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে আর ও ১০০ বছর পরেও সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য মাত্রা অধরাই থেকে যাবে।

ভারতে একজন পুরুষ শ্রমিকের আয় যদি ১০০টাকা হয় তাহলে নারী শ্রমিকের আয় মাত্র ৪০টাকা। এই বৈষম্য সরকারের অজানা নয় কিন্তু পরিতাপের বিষয় ক্ষমতাসীন সরকার এই বৈষম্য কে অস্বীকার ও গোপন করায় যতটা তৎপর বৈষম্য দূর করার জন্য করণীয় পদক্ষেপ গ্রহণে তার সিকি ভাগ ও উৎসাহী নন।

কেন্দ্রীয় শ্রম ও নিয়োগ মন্ত্রক থেকে একটি নতুন শ্রম নীতির খসড়া প্রস্তাব প্রকাশিত হয়েছে - শ্রম শক্তি নীতি-২০২৫। এটি এখনও পর্যন্ত প্রচুর বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এই খসড়া নীতিতে উল্লেখ রয়েছে যে এর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে শ্রম ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি। অথচ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সমূহে যুক্ত মহিলা কর্মীরা সরকারী স্বীকৃতি র ক্ষেত্রে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে কিনা সে বিষয়ে এই খসড়ায় কিছু ই বলা হয় নি। এই মহিলা কর্মীদের সংখ্যা কয়েক কোটি। আশা, অঙ্গনওয়াড়ি, মিড ডে মিলের কর্মীরা পূর্ণসময়ের কর্মীদের মতো কাজ করার পরেও আজও তারা স্বেচ্ছাসেবী কর্মী হিসেবে ই পরিচিত। এদের জন্য যথার্থ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কি ভাবে সুনিশ্চিত হবে সে বিষয়টি ও খসড়া প্রস্তাবে স্পষ্ট নয়। সবকিছু মিলে বলা যায় , অবস্থার পরিবর্তন কি ভাবে এবং কতটা হবে তা নিয়ে সকলেই দোলাচলে রয়েছেন।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং আর্থিক স্বনির্ভর তার যে পরিসংখ্যান দেখানো হচ্ছে তার মধ্যে প্রচুর অসঙ্গতি বা গোঁজামিল রয়েছে। মহিলারা নিজের রোজগারের অর্থ নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খরচ করতে এখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন নন। অথচ গবেষণা বলে এই স্বাধীনতা পারিবারিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই ইতিবাচক ফল আনে। এই সহজ সত্য টি সাধারণের কাছে বোধগম্য অথবা গ্রহণযোগ্য নয়। হয়তো সে কারণে ই নারীর ক্ষমতায়ন (আপামর নারীদের) আজ ও সোনার পাথর বাটি হয়েই রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে সরকারের সদিচ্ছা ও দৃঢ় ভূমিকা ই একমাত্র কাম্য।

প্রতি আটচল্লিশ ঘণ্টায় এ দেশে পুলিশ হেফাজতে একটি মৃত্যু

(ত্রিপুরা দর্পণের পাতা থেকে)

তিন বছর ধরে কমার লক্ষণ দেখিয়ে ফের বেড়ে গেল ভারতে পুলিশ হেফাজাত মৃত্যুর সংখ্যা। ১০২৫-এর ১ এপ্রিল থেকে ২০২৬ এর ১৫ মার্চ পর্যন্ত এক বছরেরও কম সময়ে ১৭০ জন মারা গিয়েছেন পুলিশ হেফাজতে। মানে প্রায় প্রতি দু'দিন বা ৪৮ ঘণ্টায় ভারতে পুলিশ হেফজাতে মারা যাচ্ছেন অন্তত এক জন। যে পরিসংখ্যান শিউরে ওঠার মতোই। এর আগে ২০২১-২২-এ পুলিশ হেফাজতে মৃতের সংখ্যা ছিল ১৭৬। তার পরে ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪. ২০২৪-২৫-এ এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৬৩, ১৫৭ এবং ১৪০। সভ্য সমাজে যা অপরিসীম লজ্জার নজির বলেই গণ্য হয় পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর সেই ঘটনা ফের বেড়ে যাওয়ায় দুনিয়ার সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রে আইনরক্ষকদের আদৌ আইনের প্রতি সমীহ আছে কি না, সে প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। হেফাজতকারীরই দায়িত্ব হেফাজতে থাকা ব্যক্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করা। তার বদলে রক্ষকই যে ভক্ষক হয়ে দাঁড়াচ্ছে, পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর পরিসংখ্যান সে দিকেই ইঙ্গিত করছে। আইনের শাসনের ধারণাও প্রশ্নের মুখে পড়ছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, গত পাঁচ বছরে পুলিশ হেফাজতে এত অগুন্তি মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে মোটে একটি ক্ষেত্রে নামমাত্র বিভাগীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে। মঙ্গলবার লোকসভায় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই এই সব পরিসংখ্যান পেশ করেছেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নিয়মিত সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতেই সরকার সার্বিক এই পরিসংখ্যান পেশ করেছে। ২০২৫-২৬-এ পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর পরিসংখ্যানে শীর্ষে রয়েছে বিহার। সেখানে আগের বছর মারা গিয়েছিলেন ১০ জন, এ বার তা বেড়ে হয়েছে ১৯ । রাজস্থানে আগের বারের ৯ থেকে বেড়ে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও পাঞ্জাবএই চার রাজ্যের প্রতিটিতে ২০২৫-২৬-এ পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর সংখ্যা ১৫। ওড়িশায় পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা লক্ষণীয় ভাবে বেড়েছে। ২০২১-২২-এ যেখানে মাত্র ২টি এ রকম ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছিল, ২০২৫-২৬-এ এসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯। ছত্তীশগড়, হরিয়ানা, নাগাল্যান্ড, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, দিল্লি, পুদুচেরি, কর্নাটক, তামিলনাড়ু প্রায় সর্বত্রই হেফাজতে মৃত্যু বেড়েছে। অন্য দিকে, ২০২১-২২-এ মহারাষ্ট্রে ৩০ জন মারা গিয়েছিলেন পুলিশ হেফাজতে, তা ২০২৫-২৬-এ কমে হয়েছে ১৪। অসম, ঝাড়খণ্ড, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, চণ্ডীগড়েও পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু কমেছে। গোয়া, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, সিকিম, ত্রিপুরা এবং জম্মু-কাশ্মীরে ২০২৫-২৬-এ পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর একটিও ঘটনা নথিভুক্ত হয়নি। এক সাংসদের নির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মঙ্গলবার লোকসভায়

বিশদ এই তথ্য-পরিসংখ্যান পেশ করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত। একই সঙ্গে জেলখানার অবর্ণনীয় অবস্থার ছবিও উঠে এসেছে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পেশ করা পরিসংখ্যানে। ২০২৩-এর ৩১ ডিসেম্বরের হিসেবজেল হেফাজতে বিচারাধীন বন্দি ছিলেন ৩,৮৯,৯১০ জন। আর সাজাপ্রাপ্তের সংখ্যা ছিল ১,৩৫,৫৩৬ জন। সব মিলিয়ে বন্দি ছিলেন ৫,২৫, ৪৪৬ জন। যা ১৩০০-র কিছু বেশি জেলখানার সর্বমোট ধারণক্ষমতার ঢের বেশিই। এই উপচে পড়া ভিড়ের পরিসংখ্যান 'সংশোধনাগার' ধারণাটিকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, সবচেয়ে বেশি বিচারাধীন বন্দি রয়েছেন উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও মহারাষ্ট্রে যথাক্রমে ৭৩,৪৯১ জন, ৪৬,৫২৯ জন এবং ৩২,৪৩৮ জন। 'বিচারাধীন' মানে বিচারে অভিযোগ প্রমাণই হয়নি। তার আগেই লক্ষ লক্ষ মানুষের সুদীর্ঘ কারাবাস বিচারব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে।

২০২৪ আগস্টে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে টি এইচ আরও

দ্বি- মত মানেই সন্ত্রাস?

- তীর্থরাজ ধর

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। দিল্লির উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হিংসায় প্রাণ হারান ৫৩ জন মানুষ। আহত হন বহু। ছয় বছর পরেও বিচার প্রক্রিয়া কার্যত স্থবির। অথচ এই মামলায় বিনা বিচারে কারাগারে বন্দি আছেন ছাত্রনেতা উমর খালিদ এবং অ্যাক্টিভিস্ট শারজিল ইমাম। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে সুপ্রিমকোর্ট তাঁদের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়। এই রায় নিছক একটি আইনি সিদ্ধান্ত নয়, এটি ভারতীয় গণতন্ত্রের চরিত্র সম্পর্কে একটি গভীর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

Gulfisha Fatima v. State (NCT of Delhi) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে খালিদ ও ইমাম দিল্লি দাঙ্গার ঘটনাগুলিকে "ইঞ্জিনিয়ার" করেছিলেন। তাঁরা "ষড়যন্ত্রের স্থপতি", "চালক", "পরিচালক"। কিন্তু আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে মূলত পুলিশের চার্জশিটের বয়ানকে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করে — স্বাধীনভাবে প্রমাণ যাচাই না করে।

এখানেই আইনি সমস্যার শুরু। ভারতীয় আইনশাস্ত্রে *Vernon v. State of Maharashtra* মামলার নির্দেশ অনুযায়ী, জামিনের পর্যায়ে প্রমাণ কিছুটা হলেও খতিয়ে দেখা আবশ্যক। কিন্তু এই রায়ে সেই মান মানা হয়নি। পুলিশের কথাই চূড়ান্ত সত্য হয়ে উঠেছে।

বাস্তব তথ্যগুলো উপেক্ষিত হয়েছে একের পর এক। উমর খালিদ দাঙ্গার সময় দিল্লিতেই ছিলেন না। কোনো সাক্ষী তাঁকে হিংসার স্থানে দেখেননি। তাঁর কাছ থেকে কোনো অস্ত্র বা অর্থ উদ্ধার হয়নি। তিনি নিজে দিল্লি পুলিশ কমিশনারকে চিঠি লিখে সাক্ষীদের ওপর চাপের বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। শারজিল ইমামের ক্ষেত্রেও একই চিত্র — তাঁর বক্তিতায় "চাক্কাজ্যাম"-এর উসকানি ছিল বলে দাবি করা হলেও, সেই বক্তিতা পরে কোথাও কোনো হিংসার ঘটনা ঘটেনি।

এই তথ্যগুলো আদালতে উপস্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু বিচারপতিরা বললেন, চার্জশিটের বয়ান "যুক্তি সংগতভাবে" অভিযোগকে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত করে। এটুকুই যথেষ্ট।

আন ল ফুল অ্যাক্টিভিটিজ প্রিভেনশন অ্যাক্ট (UAPA)- এর ধারা ১৫ অনুযায়ী "জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি" বা "অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিঘ্ন" সন্ত্রাস হিসেবে গণ্য হতে পারে। এই

মামলায় আদালত বলেছে, রাস্তা অবরোধ, প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন, বা "চাক্কাজ্যাম" পরিকল্পনা এই সংজ্ঞার আওতায় পড়তে পারে।

এর অর্থ কী দাঁড়ায় ? যে কোনো নাগরিক আন্দোলন, যে-কোনো সংগঠিত প্রতিবাদ – রাষ্ট্র যদিতাকে "কৌশলগত ভাবে বিপজ্জনক" বলে চিহ্নিত করে, তা হলে তা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ হয়ে যেতে পারে । গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে যে সীমারেখা, তা এই রায়ে মুছে যাচ্ছে।

Union of India v. K. A. Najeeb মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নিজেই বলেছিল যে দীর্ঘবিচার পূর্ব কারাবাস যদি অনুচ্ছেদ ২১ এর লঙ্ঘন হয়ে ওঠে, তা হলে সাংবিধানিক আদালত UAPA-র ৪৩ ডি(৫) ধারার বাধা সত্ত্বেও জামিন দিতে পারে । কিন্তু গুলফিশাফাতি মারায়ে সেই নীতিকে কার্যত নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে।

উমর খালিদ বা শারজিল ইমামের ব্যক্তিগত পরিণতির বাইরেও এই মামলার তাৎপর্য বিশাল । এই রায় একটি বার্তা দেয় – UAPA-র অধীনে একবার "ষড়যন্ত্র"-র অভিযোগ উঠলে, জামিন ব্যতিক্রম, নিয়ম নয় । রাষ্ট্রের বিরোধিতা করাই সন্দেহের যথেষ্ট কারণ হয়ে ওঠে । নিরাপত্তা সংস্থাগুলি কোনো বিচার ছাড়াই অ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব গড়ে তুলতে পারে।

উমর খালিদ ও শারজিল ইমাম বারবার প্রকাশ্যে অহিংসার কথা বলেছেন । তাঁদের বক্তিতায় গান্ধীবাদী অবস্থানের কথা স্পষ্ট — রাস্তা অবরোধ করো, শান্তিপূর্ণভাবে বসে থাকো, কিন্তু হিংসা থেকে দূরে থাকো। এমনকি পুলিশের নিজস্ব নথিতেও এমন বক্তিতার অংশ রয়েছে যেখানে ইমাম ভিড়কে উত্তেজনা থেকে বিরত রাখার আহ্বান জানাচ্ছেন । কিন্তু রাষ্ট্র বলেছে, এই অহিংসার ভাষা নিছক ছদ্মবেশ — আসল উদ্দেশ্য আড়াল করার কৌশল। এবং সুপ্রিমকোর্ট এই ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছে কোনো স্বাধীন যাচাই ছাড়াই । এর মানে হলো, একজন অভিযুক্ত যদি অহিংসার কথা বলেন, তাহলেও তা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে পারে, কারণ রাষ্ট্র বলতে পারে এটা "ক্যামোফ্লেজ"। এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য হলে, যেকোনো প্রতিবাদকারীর যেকোনো কথাকেই সন্দেহের আলোয় দেখা সম্ভব। আদালতের এই অবস্থান শুধু উদ্বেগ জনক নয় — এটি ভয়ংকর ভাবে বিপজ্জনক।

এই মামলার চার্জশিট নিজেই একটি অস্ত্র । প্রথম চার্জশিটটি ১০,০০০ পৃষ্ঠার, যেখানে ৭৪৭ জন সাক্ষীর নাম রয়েছে। পরবর্তী চার্জশিট ১৭,০০০ পৃষ্ঠারও বেশি। পুলিশ আদালতকে

জানিয়েছিল যে তারা অভিযুক্তকে ১১ লক্ষ পৃষ্ঠার নথি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়। এই বিপুল পরিমাণ নথি বিচারপূর্বক পর্যালোচনা করতে বছরের পর বছর লেগে যাবে এবং সেটাই কার্যত উদ্দেশ্য। চার্জশিট একের পর এক দাখিল হতে থাকায় বিচার শুরু ইহয়নি। অভিযুক্তরা জামিন পাচ্ছেন না কারণ UAPA আছে; বিচার হচ্ছেনা কারণ নথির পাহাড় আছে । এই দুটি মিলিয়ে তৈরি হয় একটি নিখুঁত কারাগার — আইনের ভেতরে, কিন্তু ন্যায়বিচারের বাইরে। সুপ্রিমকোর্টের ভূমিকা অবশ্যই ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে নয়।

এই মামলার প্রতিধ্বনি উত্তর-পূর্বভারতে, বিশেষত ত্রিপুরায়, অত্যন্ত চেনা। UAPA র প্রয়োগ এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্কের কেন্দ্রে। ২০২১ সালে ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক হিংসার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার অভিযোগে একাধিক সাংবাদিক ও আইনজীবীর বিরুদ্ধে UAPA প্রয়োগ করা হয়েছিল। রিপোর্ট করাই অপরাধ হয়ে গিয়েছিল । উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে আদিবাসী অধিকার আন্দোলন, ভূমিরক্ষার সংগ্রাম, এবং রাষ্ট্রীয় নীতির বিরোধিতাকে বারবার "জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দিল্লির এই রায় সেই প্রবণতাকে সর্বোচ্চ আদালতের স্বীকৃতি দিয়েদিল । ফলে ত্রিপুরা-সহ গোটা উত্তর-পূর্বের মানবাধিকারকর্মী, সাংবাদিক এবং সংগঠকদের জন্য এই নজির সরাসরি বিপদের বার্তা বহন করে।

দিল্লির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষ এখনও ন্যায়বিচার পাননি। কিন্তু যাঁরা সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন, তাঁরা আজ কারাগারে। ইতিহাস যখন এই অধ্যায়ের মূল্যায়ন করবে, তখন প্রশ্নটা শুধু দুটি ব্যক্তির স্বাধীনতার থাকবে না – প্রশ্নটা হবে, গণতন্ত্র কি সত্যিই টিকেছিল?

মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনায় টি এইচ আর ওর প্রতিবাদ : চুম্বক উপস্থাপনা

- মনিময় রায়

ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন নিপীড়িতদের পাশে রয়েছে। কিছু দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হলো।

নৃশংসভাবে শিক্ষক খুন

---

১৯ শে আগষ্ট ২০২৪, উদয়পুরের একজন শিক্ষককে বাড়ির কাছ তুলে নেয় দুষ্কৃতিকারীরা। অপহরনের পর শিক্ষককে আটকে রেখে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হয়। পরবর্তী সময়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ঐ শিক্ষককে। পুলিশ হেফাজতে ঐ শিক্ষকের মৃত্যু হয়। টি এইচ আর ও ঐ শিক্ষকের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েঘটনার প্রতিবাদ করেছে ও দোষিদের কঠোর শাস্তি দাবি করেছে।

পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু

---

১৬ অক্টোবর ২০২৪। দক্ষিণ ত্রিপুরার মনুবাজারের বিপিন চন্দ্র পাড়ার বাদল ত্রিপুরাকে একটি অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরের দিন হাজত হিংসায় বাদল ত্রিপুরার মৃত্যু হয় পুলিশ হেফাজতে। টি এইচ আর ও এই ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ও দায়ী অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছে।

প্রকাশ্য দিবালোকে জেলা পরিষদ প্রার্থী বাদল শীল খুন

১১ই জুলাই ২০২৪ এ দক্ষিণ জেলার জেলা পরিষদের প্রার্থী বাদল শীল ক্ষমতাসীন দলের দুষ্কৃতীদের হাতে দিনের বেলায় আক্রান্ত হন।১৩ তারিখ মারা যান। এই ভয়ঙ্কর ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে টি এইচ আর ও দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের ও শাস্তির দাবি করে। পরবর্তী সময়ে গ্রেফতার হওয়া দুষ্কৃতীদের আইনানুগ শাস্তি প্রদানের জন্য টি এইচ আর ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করেছে। বর্তমানে ঐ দুষ্কৃতীদের হাজতে রেখে বিচার চলছে।

মোবাইল বিক্রেতা খুনে অভিযুক্তের গণধোলাইয়ে মৃত্যু

২৪শে অক্টোবর, ২০২৪ এ বিজয়া দশমীর দিন মেলারমাঠে একজন মোবাইল বিক্রেতা হরি শংকর সাহা খুন হন জনৈক রাহুল রায়ের হাতে। টি এইচ আর ও এই খুনের তীব্র নিন্দা

জানিয়েছে। কিন্তু এরপরের ঘটনা আরও ভয়ঙ্কর। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের সামনে অভিযুক্ত রাহুলকে প্রকাশ্যে পিটিয়ে মেরে ফেলে উন্মত্ত জনতা।টি এইচ আর ও এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছিল, পুলিশের সামনেই এই হত্যাকাণ্ড সভ্যতার লজ্জা বলে অভিহিত করা হয়। ঐ হত্যাকাণ্ডের কোনো বিচার হয়নি, উপস্থিত কর্তব্যরত পুলিশের দায়িত্বহীনতারও শাস্তি হয়নি আজও।

প্রকাশ্য রাস্তায় পুড়িয়ে হত্যা

২০২৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ভোর রাতে উদয়পুরের কাকড়াবনে পুড়িয়ে মারা হয় একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পঙ্কজ সরকারের স্ত্রী অঞ্জলি সরকারকে। দেবী দুর্গার বোধনের দুদিন আগে এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি,পাঁচ জন অভিযুক্ত কাঁকড়াবন থানায় আত্মসমর্পণ করে। টি এইচ আর ও এই ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা না বলে রাজ্যে বিরাজমান নৈরাজ্যের স্বাভাবিক পরিণতি বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং দোষীদের শাস্তি দাবী করে।

দাদু কর্তৃক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি ও খুনের চেষ্টা

৫ই অক্টোবর ২০২৫ আগরতলার দক্ষিণ জয়নগরে " --- "শ্রেণির এক ছাত্রীকে পাড়ার পাতানো দাদু একটি বিশেষ উপহার দেবার ছলে বাড়িতে ডেকে নিয়ে শ্লীলতাহানি করে এবং জোর করে মারাত্মক কীটনাশক খাইয়ে দেয়। ছাত্রীটিকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মৃত্যু মুখে পতিত এই ছাত্রীটিকে সুচিকিৎসা দিতে টি এইচ আর ও হাসপাতালে ডাক্তার ও স্বাস্থ্য দফতরের সহায়তা দাবি করে ডেপুটেশন দেয়। একই সাথে ঐ অভিযুক্ত দাদুকে গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির দাবি করে। টি এইচ আর ও র দাবি মেনে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর ঐ ছাত্রীর উন্নত চিকিৎসার জন্যে দিল্লির এইমসে পাঠায়। ছাত্রীটি সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে। অভিযুক্ত দাদু এখনো হেফাজতে। আক্রান্ত ছাত্রীর চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করায় টি এইচ আর ও স্বাস্থ্য দফতরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।

ওয়াগন ভর্তি ফেন্সিডিল

২১শে অক্টোবর ২০২৫ এ ভারতীয় রেলের একটি পণ্যবাহী ওয়াগন বিভিন্ন রেল স্টেশন অতিক্রম করে আগরতলার কাছেই জিরানীয়া স্টেশনে প্রবেশ করে।ওয়াগন খালি করার সময় দেখা যায় ওয়াগন ভর্তি নেশা সামগ্রী ফেন্সিডিল এসেছে। পুলিশ চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। এর বিরুদ্ধে টি এইচ আর ও তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। টি এইচ আরও প্রতিক্রিয়ায়

বলেছে প্রশাসন বিশেষ করে আরক্ষা দপ্তরের একাংশের প্রত্যক্ষ মদতে রাজ্য নেশার সাগরে ভাসছে এবং নেশা বাণিজ্যের প্রচণ্ড রমরমা।

স্কুলের অবহেলায় ছাত্রীর মৃত্যু

---

১৮ ই নভেম্বর ২০২৫ ,প্রায় সাতদিন লড়াইয়ের পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো দ্বীপান্বিতা পাল(৭)। আগরতলার শহীদ ক্ষুদিরাম উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী দীপান্বিতা একটি অনুষ্ঠানে সকলের সাথে কড়া রোদে দাঁড়িয়ে ছিল।ওর শরীর খারাপ লাগছে বলে জনৈক দিদিমনিকে জানিয়েছিল। দিদিমনি গুরুত্ব দেননি।পরে অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ায় বাড়ীর লোকেরা দীপান্বিতাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে জানানো হয় তার অবস্থা ভালো নয়। শুধু হয় 'যমে মানুষে টানা টানি 'শেষ পর্যন্ত হেরে যায় দীপান্বিতা। টি এইচ আর ওর এক প্রতিনিধি দল প্রয়াত দীপান্বিতার বনকুমারি স্থিত বাড়িতে যাবার পর বাড়ির পক্ষ অভিযোগ করা হয় স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনো দায়িত্ব নেয়নি। সেখানেই দাঁড়িয়ে সংস্থার সম্পাদক পুরুষোত্তম রায় বর্মণ প্রয়াত দ্বীপান্বিতার স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির তীব্র নিন্দা করে বলেছেন "দ্বীপান্বিতার মৃত্যু দুঃখজনক, পরিবারের কাছে তো বটেই কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা মেনে নেয়া যায় না, শিক্ষা দফতরকে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে"। শিক্ষা দফতর অবশ্য নির্বিকার।

সংবিধান দিবসেও দুষ্কৃতীদের হাতে রেহাই নেই

সংবিধান দিবস পালন করতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন ধর্মনগরের সংযুক্ত কিষান মোর্চার নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক অমিতাভ দত্ত ও রতন রায়। ধর্মনগরে কর্মসূচি পালন করার সময় দুষ্কৃতীদের দা,লাঠির মুখে পড়ে রক্তাক্ত হন তাঁরা। ধর্মনগর থেকে জরুরি ভিত্তিতে তাঁদের আগরতলায় পাঠানো হয়।টি এইচ আর ও র প্রতিনিধিরা হাসপাতালে যান এবং ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের শাস্তি দাবি করেন।এই ঘটনার সাথে যুক্ত একজনও গ্রেফতার হয়নি।

নাম জেনে নিয়ে পেটানো হল রিক্সা চালক দিদার হোসেনকে

২০২৬ সাল শুরু হলো দুষ্কৃতীদের দুষ্কর্ম দিয়ে।২রা জানুয়ারি সন্ধ্যায় রিক্সা শ্রমিক দিদার হোসেন এক আরোহীকে পৌঁছে দেন গান্ধাইলের নিবেদিতা ক্লাবের সামনে। ফিরে আসার সময় কিছু দুষ্কৃতী দিদার হোসেনের পথ আটকায় ও নাম জিজ্ঞেস করে।দিদার হোসেন নাম

শোনার পর তাকে বাংলাদেশী বলে বেধড়ক মারধোর করে তার টাকা পয়সা কেড়ে নেওয়া হয় ও বালি চাপা দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়। নিজের চেষ্টায় বালি সড়িয়ে দিদার হোসেন বেড়িয়ে এলে অন্যান্যদের সাহায্যে তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয় ও পুলিশের কাছে অভিযোগ জমা দেয়া হয়। এই জঘন্য অপরাধের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন টি এইচ আরও ।

সরকারী সাহায্য অনুপস্থিত: ভয়াবহ বন্যায় আক্রান্তদের পাশে টি এইচ আর ও

২০২৪ সালের আগস্ট মাসে, অবিশ্রান্ত বর্ষণে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছিল ত্রিপুরা। চারদিনের এই বর্ষণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় দক্ষিণ জেলার কৃষিজীবী মানুষ। কিছুই প্রায় রক্ষা করা যায় নি। বসে থাকতে পারে টি এইচ আর ও। নিজেদের উদ্যোগে ত্রান সামগ্রী নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল সহায়সম্বলহীন মানুষের পাশে। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪, সকালে ত্রান সামগ্রী নিয়ে পৌঁছে যায় আক্রান্তদের পাশে। প্রথমেই গন্তব্য ছিল পালাটানা। গোমতীর বাঁধভাঙা জলের তান্ডবে কিছুই প্রায় বাঁচাতে পারেননি। ত্রাণ সামগ্রীতে ছিল চাল,ডাল, আলু ও শুকনো মাছ।

এরপর টি এইচ আর ও রওনা হয় অমরপুর মহকুমার দিকে,যে মহকুমা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ঐ বন্যায়। ভয়ঙ্কর অবস্থা ছিল পশ্চিম ডলুমা ,মালবাসা ও জমাতিয়া পাড়ার। ত্রান নিয়ে পৌঁছানোর পর ডলুমা এলাকার আক্রান্ত মানুষ জড়ো হয়ে ত্রান নিয় যান। মালবাসা এলাকার কৃষিজীবী মানুষ সর্বস্ব খুইয়েছে। কোনো প্রশাসনিক সহায়তা নেই। সুশৃঙ্খলভাবে এই ত্রানের প্যাকেজ তাদের হাতে তুলে দেন টি এইচ আর ও র স্বেচ্ছাসেবকরা।সেখান থেকে মালবাসার অন্তর্ভুক্ত আরও প্রত্যন্ত এলাকায় জমাতিয়া পাড়ার বন্যায় আক্রান্তদের হাতে তুলে দেয়া হয় ত্রান। তাঁরাই জানান যে কোনো সরকারী সাহায্য তাঁদের দরজায় আসে নি। সেখানকার জহর জমাতিয়া সকলের হয়ে কৃতজ্ঞতা জানান। টি এইচ আর ও এর উদ্যোগে অমরপুরে ত্রান বন্টন কর্মসূচিতে টি এইচ আর ওর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাথে সাংবাদিক মোসলেম উদ্দিন সহায়তা করেছেন।

'কন্টেন্ট ক্রিয়েটর' মাধবী বিশ্বাস ও তাঁর ছেলের ওপর প্রাণঘাতি হামলা: নিন্দায় টি এইচ আর ও

নিরবে নিভৃতে একমাত্র ছেলেকে নিয়ে রাতে নিজের বাড়িতে ঘুমচ্ছিলেন মা মাধবী। আনুমানিক রাত একটা-দেড়টা নাগাদ শ খানেক (মাধবীর বক্তব্য অনুযায়ী) দুষ্কৃতী এলাকার পুরো বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে তাঁর বাড়ির দরজা ভেঙে ঢুকে প্রথমে তিন লাখ টাকা দাবি

করে।মাধবী টাকা দিতে 'অসমর্থ' বলার সাথে সাথেই মার শুরু হয়।।মা ছেলেকে রড ও ধাড়ালো অস্ত্রদিয়ে মেরে শুইয়ে দেয় দুষ্কৃতিকারীরা। হাত ভেঙে দেয়া হয় মাধবীর ছেলের।মাধবীর মাথা ফাটিয়ে দেয়া হয়, ছিঁড়ে দেওয়া হয় তাঁর গায়ের জামা। চলতে থাকে মারধোর ও লুটতরাজ, সাথে চলতে থাকে 'লাইভ ভিডিও' সেখানে এই সন্ত্রাসীদের নেতা একজনকে "স্যার" সম্বোধনে ধারাবিবরণী দিচ্ছিল। আলমারি ভেঙে টাকা পয়সা, সোনার জিনিস পত্র লুঠ করে দুষ্কৃতিকারীরা । ব্যাপক চিৎকার চেঁচামেচি শুনে আশেপাশের মানুষ ছুটে এলে ঐ সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। মারাত্মক আহত অবস্থায় থাকা মা - ছেলেকে উদ্ধার করে পুলিশের সাহায্যে প্রথমে আই জি এম এবং পরে জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয় মা-ছেলেকে।ঘটনাটি ঘটে ১২ এপ্রিল রাত একটা -দেড়টা নাগাদ(অর্থাৎ ১৩ ই এপ্রিল মাঝ রাতে)। ঘটনার খবর পেয়েই ১৩ এপ্রিল বিকেলেই টি এইচ আর ও সম্পাদক পুরুষোত্তম রায় বর্মণের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল জিবি হাসপাতালে ছুটে যান এবং সমস্ত ঘটনাবলি জানেন। পরে শ্রীপুরুষোত্তম রায় বর্মণ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন "আবার প্রমাণ হল রাজ্যে আইনের শাসন নেই।মাধবী একজন প্রতিবাদী মহিলা তাঁর মুখ বন্ধ করতেই এই আক্রমন,এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে টি এইচ আর ও, সাথে সাথে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তি দাবি করছে।' উল্লেখ্য,মাধবী বিশ্বাস বিভিন্ন সময়ে সরকারের সমালোচনা সহ চলতি ঘটনাবলী নিয়ে সমাজ মাধ্যমে ভিডিও সহ মন্তব্য করেন। যা সরকারে থাকা একটি রাজনৈতিক দলকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে।সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে একজন মহিলাকে দিয়ে মামলা (মিথ্যে বলে অভিযোগ) করিয়ে মাধবীকে থামানোর জন্য গ্রেফতার করানো হয়েছিল। প্রায় ৭৫ দিন জেলে থেকে তিনি মুক্তি পান। কিন্তু তাঁকে দমানো যায়নি।এরপর এই আক্রমন। এবারের আক্রান্ত হবার পর হাসপাতাল থেকে বেশ কিছুদিন পর ছুটি পেয়েই মাধবী ঐ আক্রমণের ঘটনা নিয়ে একটি এফ আই আর করেন। এরপর পুলিশ মাধবীকে সাথে নিয়ে তদন্তে মাধবীর বাড়িতে যায়, এবং সেখান থেকে ঐদিনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতীদের ফেলে যাওয়া ধাড়ালো অস্ত্র সহ লোহার রড উদ্ধার করে। ধারনা করা হচ্ছে এলাকার মানুষকে আসতে দেখে পালাতে গিয়ে এই অস্ত্রগুলো দুষ্কৃতীরা ফেলে যায়।মাধবী জানিয়েছেন, 'অন্ধকার থাকায় ও ওদের মুখ বাঁধা থাকায় সবাইকে চিনতে পারিনি, তবে সামনে আনলে চিনতে পারবো'।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন করলো টি এইচ আর ও

প্রতি বছরের মতো এবারও(২০২৬) মিছিল ও সমাবেশের মাধ্যমে ১০ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন করেছে ত্রিপুরা মানবাধিকার সংস্থা। সিটি সেন্টারের সামনে থেকে টি এইচ আর ও মিছিল পুরো শহর পরিক্রমা করে প্যারাডাইস চৌমুহনীতে এসে একসভায় মিলিত হয়। সেখানে তরুন চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়।সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক প্রশান্ত চক্রবর্তী , মৃন্ময় চক্রবর্তী ও সম্পাদক পুরুষোত্তম রায় বর্মণ বক্তব্য রাখেন।

সংলঘুরা নিজদেশে পরবাসী: আইনী সহায়তায় টি এইচ আর ও

নিজ দেশে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে পরবাসী হয়ে আছেন জয়পুর ও মতিনগরের সংখ্যালঘু মুসলিমরা। জয়পুর, আগরতলার রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত জয়পুর। কমলা সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের মতিনগর। দু জায়গার সমস্যা একটাই কাঁটাতার। ব্যবস্থা এমন তাঁদের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মর্জি মাফিক আসা যাওয়া করতে হয়। ছাত্র ছাত্রীরা স্কুল ছুটি হলে পর বাড়ি ফিরে এলেও গেট দিয়ে ঢুকতে হয় যখন গেট খুলবে তখন। বৈদ্যুতিক আলো আছে,বিল জমা দেয়া হয় নিয়মিত, কিন্তু লাইন কেটে দেবার হুমকি।ফসল চাষেও বাধা। এমন সব আলো লাগানো হয়েছে যে তীব্র আলোতে ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। চেষ্টা হচ্ছে দু জায়গার প্রায় ১৪১ পরিবারকে উচ্ছেদ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।এই গুরুতর সমস্যায় মাঝে এই শতবর্ষের অধিবাসীদের অধিকার রক্ষায় তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে টি এইচ আর ও । তাঁদের হস্তক্ষেপে বিদ্যুতের লাইন কাটা হয়নি, জেলা শাসক ও মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সাথে আলোচনা হয়েছে। সমস্যা কিছুটা মিটেছে বলে জানা গেছে। জয়পুরের কাঁটাতারের বাইরের অংশ বিদ্যুৎবিহীন।

লেক চৌমহনী বাজারে উচ্ছেদ,বুলডোজার: প্রতিবাদ টি এইচ আরও

আগরতলার লেক চৌমহনী বাজারের একটি অংশকে যেভাবে বুলডোজার দিয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা করেছে টি এইচ আরও । ঘটনা ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে। ঘটনার পরমুহূর্তেই টি এইচ আর ওর এক প্রতিনিধি দল বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ীদের কথা বলেন। বিকল্প ব্যবস্থা না করে এই ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড সরাসরি কর্মসংস্থানের ওপর আঘাত বলে সংস্থা ধিক্কার জানিয়ে টি এইচ আরও তাদের ব্যবসার জায়গা করে দিতে দাবি জানিয়েছে।

তোরা যুদ্ধ করে করবি কি তা বল!

- মিহিরলাল রায়

সত্যজিৎ রায়ের "গুপী গাইন বাঘা বাইন" সিনেমার বিখ্যাত গান –

" ওরে হল্লরাজার সেনা / তোরা যুদ্ধ করে করবি কি তা বল? /
....মিথ্যে অস্ত্র শস্ত্র ধরে / প্রানটা কেন যায় বেঘোরে? /
রাজ্যে রাজ্যে, পরস্পরে - / দ্বন্দ্বে অমঙ্গল /
তোরা যুদ্ধ করে করবি কি তা বল? "

যখন সিনেমার এই গানটি তৈরি হয়, ততদিনে এই বিশ্ব দু-দুটো বিশ্ব যুদ্ধ দেখে ফেলেছে। যুদ্ধের বীভৎসা দেখে, তার অনুভুতি – যুদ্ধ কেবল যন্ত্রণা, মানুষের দূর্ভোগ, মৃত্যুর মিছিল। তবু যুদ্ধ হয় ক্ষমতার জানান দিতে, আধিপত্য বিস্তারে। পক্ষে-বিপক্ষে সাধারণ মানুষের কারো লাভ হয় না। যদি লাভ হয় আধিপত্যবাদী, সাম্রাজ্যলোভী শাসক গোষ্ঠীরই। এজন্যই সত্যজিৎ রায় সাধারণ মানুষের কাছে, নতুন প্রজন্মের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন - তোরা যুদ্ধ করে করবি কি তা বল ?

এই যে যুদ্ধে প্রাণহানি, বাস্তুচ্যুতি, মানসিক আঘাত তার চেয়েও পরিবেশ প্রতিবেশের উপর প্রভাব আরো গভীর এবং দীর্ঘমেয়াদি। কারণ যুদ্ধের পরিণতি শুধু তাৎক্ষণিক লক্ষে অবকাঠামো ধ্বংস ও সাময়িক অন্যান্য ক্ষতিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনা। তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শ্বাস-প্রশ্বাসে, খাদ্য ও জলের ওপরও হানা দেয় । এজন্য যুদ্ধবাজদের কাছে আধুনিক প্রযুক্তির দৌলতে পরিবেশ - প্রতিবেশকে কার্যকরী ও গভীরভাবে ক্ষতি করা একটি কৌশল হিসেবেও হাজির হয়েছে| ব্রিটেনস্থিত কনফ্লিক্ট এন্ড এনভায়রনমেন্ট অবজার তাই মন্তব্য করেছে – "অনেক আধুনিক যুদ্ধেই, পরিবেশের ক্ষতি ইচ্ছাকৃত - এটি যুদ্ধের একটি কৌশল | ইরাকে তৈলক্ষেত্রে আগুন লাগানো হোক, কলম্বিয়ার বন উজাড় করা কিংবা ইউক্রেনে জল বিষাক্ত করা পরিবেশগত ক্ষতি এখন অস্ত্রে পরিণত হয়েছে।"|

ধরুন সাম্প্রতিক সময়ে ইরানের উপর যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েলের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের পরিবেশ- প্রতিবেশ বিষয়ক অভিঘাতেরই কথা | ক্লাইমেট এন্ড কমিউনিটি ইনস্টিটিউটের প্রতিবেদন বলছে, যুদ্ধের প্রথম দুসপ্তাহেই পঞ্চান্ন হাজার এগারো টন কার্বন ডাই অক্সাইড বাতাসে নির্গত হয়েছে| যা বিশ্বের চুরাশিটি দেশের সম্মিলীত বার্ষিক নিঃসরণের চেয়েও বেশি | সাময়িক যুদ্ধ বিরতির আগে পর্যন্ত যে গতিতে তেল স্থাপনাগুলোতে হামলা হয়েছে তাতে যে এই নিঃসরণ আরও কয়েকগুণ হয়েছে তা আর বলার অবকাশ রাখে না। যদি চলমান আলোচনা ভেস্তে যায়, তাহলে যা হতে পারে তা অকল্পনীয়। তাতে যে জলবায়ুর উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তা কী কেবল স্থানিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে? না, বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা আরও বাড়বে। বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা

বাড়বে। জলবায়ু হয়ে পড়বে আরও অস্থির। খরা ও দাবানলের মতো চরম আবহাওয়ার ঘটনা চরম বাড়তে থাকলে অবাক হবার কিছু থাকবে না।

মার্চে শুরু হওয়া, এই যুদ্ধে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাতে সরাসরি হামলার ঘটনাও ঘটেছে। ইজরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে ইরানের নাতাঞ্জে ও আরদাকান পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালায়। এই প্রতিক্রিয়ায় ইরানও ইজরায়েলের দিমানো পারমানবিক কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়।

২০০৫ সালেও নাতাঞ্জ ও কোর্দো পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা হয়েছিল। এসব হামলার প্রেক্ষিতে যুযুধান পক্ষ তেজস্ক্রিয়তা ছড়ানোর কথা অস্বীকার করলেও সে আশঙ্কা রয়েছে। এমনকি বিশেষজ্ঞরা "'নিউক্লিয়ার উইন্টার" সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দিচ্ছেন না। এজন্যই ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেন টু অ্যাবোলিশন নিউক্লিয়ার উইপনস (আই সি এ এন) উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

ইরান যুদ্ধে আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রের দাপাদাপি। আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উন্নত হচ্ছে। লক্ষ্যবস্তুতে নিখুঁত আঘাত হানা এবং শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দেওয়াই মূল লক্ষ্য। বর্তমান সময়ে প্রচলিত অস্ত্রের পরিবর্তে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এ আই), হাইপারসনিক গতি এবং ড্রোন প্রযুক্তির সংমিশ্রনে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলো এখন লেজার, ইনফ্রারেড বা স্যাটেলাইট (জি পি এস) গাইডেড প্রযুক্তির মাধ্যমে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূর থেকেও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত হানতে পারে। কিন্তু পরিবেশ - প্রতিবেশে তার অভিঘাতটা কেমন? প্রতিটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলাই পরিবেশ-প্রতিবেশে হুমকি। ভগ্নাবশেষ, বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং অবকাঠামো সহ অন্যান্য অবকাঠামোতে তার আঘাত গোটা অঞ্চলে দ্রুত ছড়ায়। এই যুদ্ধে যে অ্যামোনিয়া সার তৈরি কারখানা এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরন কারখানাগুলোতে হামলা হল তাতে নিশ্চিতই বিষাক্ত ও ক্ষতিকারক দূষক পরিবেশ-প্রতিবেশে ছড়িয়েছে।

এই যুদ্ধে সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্রের উপর আঘাতটাও হয়েছে মারাত্মক। সংশ্লিষ্ঠ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হরমুজ প্রণালীতে 'অয়েল স্লিক' বিপর্যয়ে ধ্বংসের মুখে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ। স্যাটেলাইট বিশ্লেষণে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। আমেরিকার হামলায় বিধ্বস্থ ইরানী ড্রোনবাহী জাহাজ 'শহিদ বাঘেরি' থেকে বিপুল পরিমাণে জ্বালানি তেল চুঁইয়ে পড়েছে সমুদ্রে। এই তেলের আস্তর বা 'অয়েল স্লিক' ধীরগতিতে পশ্চিম এশিয়ার প্রাণকেন্দ্র 'হারা ম্যানগ্রোভ' অরণ্যের দিকে ধাবমান। যা আগামী দিনে বড় সামুদ্রিক বিপর্যয় ডেকে আনবে। গত ২৭ মার্চের ভারী বৃস্টির জলের তোড়ে পলিমাটির সঙ্গে মিশে তেল আরও দ্রুত ম্যানগ্রোভের দিকে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তাকে কী হবে? পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চনের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য এটি। এই অঞ্চলটির পরিযায়ী পাখি, বিপন্ন প্রজাতির কচ্ছপ, মাছ এবং

ক্রাস্টেশিয়ান প্রজাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল। যদি তেল এই অঞ্চলে পৌছায়, তবে তা সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে বড় পরিবেশগত বিপর্যয় হতে পারে। তথ্য বলছে, হরমুজ প্রণালীতে অন্তত বারোটি জাহাজে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসব ছিল মূলত তেল পরিবহনকারী জাহাজ। প্রতিটিতেই ছিল বিপুল পরিমাণে রাসায়নিক পদার্থ, লুব্রিক্যান্ট তেল, জ্বালানি তেল ইত্যাদি। জাহাজ ডুবে যাওয়ায় এ সকল সামগ্রী সমুদ্রের জলে মিশেছে। ক্ষেপণাস্ত্র বা টর্পেডো আঘাতে চুরমার হয়ে যাওয়া জাহাজের ভেঙে যাওয়া ধাতব অংশেরও একই পরিণতি। মূলত সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের সর্বনাশ। এটা সকলেরই জানা, এমনিতেই হরমুজ প্রণালীর বাস্তুতন্ত্র অত্যন্ত ভঙ্গুর। এর অগভীর জল, উচ্চ তাপমাত্রা, সীমিত প্রাকৃতিক জলস্রোত - তাতে যুদ্ধজনিত হামলা - প্রতি হামলা - নিশ্চিতই - এর বাস্তুতান্ত্রিক সংকটকে আরও প্রকট করবে। আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে, এ দূষণ কেবল পারস্য উপসাগরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, গোটা বিশ্বের পরিবেশগত ভারসাম্যকেই এক অনিশ্চিত, অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেবে।

তাই যেকোন সচেতন মানুষই মনে করেন, আধিপত্যের জন্য, তেলের জন্য এই যুদ্ধ হলেও, যুদ্ধবাজদের স্বার্থ থাকলেও, গোটা পৃথিবীর আপামর সাধারণ মানুষের কাছে এসব যুদ্ধ বিশেষ করে তার পরিবেশ ও প্রতিবেশ ক্ষেত্রে অভিঘাতটা মারাত্মক এবং দীর্ঘমেয়াদী। আর সেজন্যই, সত্যজিৎ রায়ের উচ্চারণে, পৃথিবীর সকল শান্তিকামী মানুষেরই আওয়াজ

"ওরে হল্লরাজার সেনা / তোরা যুদ্ধ করে করবি কি তা বল ? /
.... রাজ্যে রাজ্যে, পরস্পরে - / দ্বন্দ্বে অমঙ্গল /
তোরা যুদ্ধ করে করবি কি তা বল ? "

মাধবী বিশ্বাস ও তার ছেলে ট্রমা সেন্টারে

উমর খালিদ ও সার্জিল ইমামের নিঃশর্ত মুক্তি চাই।
সুপ্রিম কোর্টের রায় বৃহত্তর বেঞ্চে পুনর্বিবেচনা করতে হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদন

ফেব্রুয়ারি ২০২০, উত্তরপূর্ব দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক হিংসা। ৫৩ জন নিহত হিংসায়। নিহতদের ও আহতদের অধিকাংশই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সাম্প্রদায়িক হিংসাকে কেন্দ্র করে ৭৫টি এফ.আই.আর (F.I.R) দায়ের হয়েছে। এর মধ্যে ২৪৯ টি মামলা এখনও তদন্তাধীন । ৭৫টি মামলায় দিল্লী পুলিশ তদন্ত রিপোর্ট জমা দিয়ে বলেছে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে মামলাগুলো খারিজ যোগ্য। ৩৮৬টি মামলায় ১৩৯ জন এখনো অব্দি বেকসুর খালাস পেয়েছেন ১২২টি মামলায় ৫১ জনের সাজা হয়েছে।

ওমর খালিদ, গবেষক, নাগরিক সংশোধন বিধির বিরুদ্ধে আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক/ চিন্তক/ সক্রিয় কর্মী। সারজিল ইমাম, গবেষক ও চিন্তক নাগরিকত্ব সংশোধন বিধির বিরুদ্ধে আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, প্রতিবাদী মুখ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে দিল্লী পুলিশ ওমর খালিদ, সরজিল ইমাম সহ নাগরিকত্ব সংশোধন বিরোধী আন্দোলনের সামনের সারির নেতৃত্বকে দিল্লির দাঙ্গার পর স্বত: প্রণোদিত F.I.R দায়ের করে জড়িয়েছে, দিল্লী পুলিশের সাজানো মামলার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে ওমর খালিদ, সার্জিল ইমামরা নাকি বৃহত্তর ষড়যন্ত্র করে উত্তর-পূর্ব দিল্লির দাঙ্গা সংগঠিত করেছে এবং বিদেশি

চক্রান্তে ওমর খালিদরা দিল্লির দাঙ্গার মূল ক্রীড়নক, চক্রী। ওমর খালিদ, সরজিল ইমামদের বিরুদ্ধে মামলায় দিল্লি পুলিশ উপা (UAPA) বা বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধক আইন প্রয়োগ করেছে। পাঁচ বছর ধরে ওমর খালিদ ও সার্জিল ইমামরা জেলে তাদের বিরুদ্ধে বিচার এখনো শুরু হয়নি বিনা বিচারে বন্দী পাঁচ বছর ধরে।

জানুয়ারি ২০২৬-এ সুপ্রিম কোর্ট গুলফিসা ফাতিমা ও অন্যান্যরা বনাম এনসিটি দিল্লি মামলার রায়ে ওমর খালিদ, সার্জিল ইমামকে জামিন দিতে অস্বীকার করেছে, অন্যদের জামিন দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায় কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সুপ্রিম কোর্টে ওই রায়ে বলেছে, ৫ বছরেও বিচার শুরু না হওয়া নাকি সংবিধানের ২১ ধারায় প্রদত্ত জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার লঙিঘত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। শুধু তাই নয়, সুপ্রিম কোর্ট ওমর খালিদ, সার্জিল ইমামের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন আগামী এক বছর জামিনের আবেদন করার ক্ষেত্রে । ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায় এক কলঙ্কজনক ও বিপদজনক নজির সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে, দমন পীড়ন ও কালাকানুনের বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষায় সুপ্রিম কোর্টের নিদারুণ ব্যর্থতা গভীরভাবে উদ্বেগজনক ও পীড়াদায়ক।

দিল্লী পুলিশের সাজানো বয়ান বিনা প্রশ্নে বিনা সংকোচে গোগ্রাসে হজম করেছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন বৃহত্তর বেঞ্চে। ওমর খালিদ, সার্জিল ইমামের নিঃস্বার্থ মুক্তি চাই। উপা (UAPA) সহ সমস্ত কালাকানুন অতিসত্বর প্রত্যাহার করতে হবে।

অস্বাভাবিককে "স্বাভাবিক" করার প্রেক্ষাপটে হাজত হত্যার দায়ে নয় পুলিশ কর্মীর ব্যতিক্রমী সাজা

- বিবেক রায়

হাজত হত্যার দায়ে নয় জন পুলিশ কর্মীর মৃত্যুদন্ড প্রদান করেছে মাদুরাইয়ের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক। পুলিশের নির্মম অত্যাচারে নিহত বাবা -ছেলে জয়রাজ ও বেনিক্স এর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রদান করতে হবে সাজাপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীদের জরিমানা হিসেবে। হাজত হিংসা ও এনকাউন্টার ডেথ প্রচন্ডভাবে ক্রমবর্ধমান এবং প্রতিকারহীন। এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্র ও সরকার নাগরিকদের উপর নিষ্ঠুরতার নতুন ধারাভাষ্য তৈরি করছে । এটাই নিয়ম । প্রতিকার পাওয়া পৃথিবী থেকে চাঁদে হেঁটে পৌঁছার চাইতেও দুরূহ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাজত হিংসা ও এনকাউন্টার ডেথের ক্ষেত্রে আদালত ও বিভিন্ন মানবাধিকার কমিশনগুলো দায়িত্ব পালন করছে না। এই প্রেক্ষাপটে মাদুরাই আদালতের রায় এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম নিঃসন্দেহে। হাজত হিংসা ও হাজত হত্যা প্রতিরোধে এবং দোষীদের সাজা নিশ্চিত করার কঠিনতম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ক্ষেত্রে এই রায় অনুপ্রেরণাকারী দৃষ্টান্ত।

তখন সারাদেশে কোভিড। ২০২০ সনের উনিশে জুন । জয়রাম ও বেনিক্স এর মোবাইল ফোন সারাই ও বিক্রির দোকান তামিলনাড়ুর তুতিকোরিনে। লকডাউনের সময় দোকান খোলা রাখার তথাকথিত অভিযোগে সাতানকুলাম থানার পুলিশ জয়রাজকে (বয়স ৫৫ বছর) থানায় তুলে নিয়ে যায়। বাবাকে থানায় নিয়ে গেছে শুনে ছেলে বেনিক্স থানায় যায়। জানতে চায় কেন বাবাকে থানায় তুলে নিয়ে গেছে। থানা বাবুদের প্রশ্ন করার অপরাধে বাবা - ছেলের উপর শুরু হয় নির্মম অত্যাচার। সারারাত ধরে চলে অত্যাচার। মৃত প্রায় বাবা - ছেলেকে সকালে পাঠানো হয় হাসপাতালে। ২২ শে জুন মারা যান বেনিক্স , ২৩ শে জুন জয়রাজ। পুলিশের দাবি জয়রাজ ও বেনিক্স নিজেরাই নিজেদের জখম করেছেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অন্য কথা বলে। থানা হাজতে নির্মম অত্যাচারের ফলেই বাবা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিবাদের ঝড় উঠে মাদুরাই সহ তামিলনাড়ুতে। মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চ স্বতঃ প্রণোদিতভাবে মামলা গ্রহণ করে। প্রমাণ লোপাট যাতে পুলিশ না করতে পারে তাই সাতানকুলাম থানা সিজ করা হয় । দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় রেভিনিউ ইন্সপেক্টর এর হাতে। জনমতের চাপে পড়ে তামিলনাড়ু সরকার বাধ্য হয় তদন্তের ভার সিবিআই এর হাতে তুলে দিতে। মাদুরাই হাইকোর্টের তদারকিতে সিবিআই তদন্ত শুরু করে। ২০২০ সনের সেপ্টেম্বরে প্রথম চার্জশিট পেশ করে সিবিআই। অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ করে ২০২৪ এ ।

হাইকোর্টের নির্দেশে দায়রা আদালত বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে শুরু করে। থানার এক মহিলা সাব - ইন্সপেক্টর সাক্ষ্য দিয়ে জানান ,লকআপে নিগ্রহ করা হয়েছে বাবা ও ছেলেকে। থানার সিসিটিভি ফুটেজেও পুলিশের অত্যাচারের অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। নয়জন সাজাপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন, ইন্সপেক্টর এস শ্রীধর, দুই সাব-ইন্সপেক্টর পি রঘু গনেশ ও কে বালা কৃষ্ণান, দুজন হেড কনস্টেবল এস মুরুগান ও এ সামমিদুরাই এবং চার কনস্টেবল মুথুরাজ, চেল্লা দুরাই, টমাস ফ্রান্সিস ও ভেলিমুথু। অভিযুক্ত এক স্পেশাল সাব ইন্সপেক্টর পালা দুরাই মামলা চলাকালীনই মারা যান।

হাজত হিংসা ও হাজত হত্যার ৯৯% ক্ষেত্রেই প্রমাণ লোপাট করা হয়। তদন্তের নামে যা করা হয় তা প্রহসনকেও হার মানায় । নাগরিক সমাজ, মানবাধিকার কমিশন ও বিচার ব্যবস্থা দায়িত্ব পালন করে না । তাই উর্দি পড়া অপরাধীরা ডাবল প্রমোশন পায় সাজার বদলে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের সংবর্ধনাও জোটে। সব শিয়ালের এক রা, হুক্কা হুয়া। কোন থানায় অভিযুক্তকে পিটিয়ে খুন করা হলো তখন অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীকে বাঁচাতে সমগ্র পুলিশ, প্রশাসন ও সরকার মাঠে নেমে পড়ে। তথাকথিত সুনাম রক্ষার তাগিতে । চুলোয় যাক মানবাধিকার। চুলোয় যাক মানুষের জীবনের অধিকার। সংবিধান ও আইন থাকবে শুধুমাত্র সংবিধান ও আইনের পুস্তকে। মাদুরাইয়ের তুতিকোরিনের হাজত হিংসায় নিশংসভাবে নিহত জয়রাজ ও বেনিক্স এর খুনিরা সাজা পেল নিম্নোক্ত কারণগুলোতে :

ক. নাগরিক সমাজের প্রবল প্রতিবাদ ।

খ. তামিলনাড়ুর মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সক্রিয়তা ।

গ. প্রচার মাধ্যমের সদর্থক ভূমিকা ।

ঘ. মাদুরাই উচ্চ আদালতের স্বত: প্রণোদিত মামলা গ্রহণ ।

ঙ. মাদুরাই উচ্চ আদালতের নির্দেশে ঘটনার অব্যবহিত পরেই সাথানকুলাম থানা সিজ করে রেভিনিউ ইন্সপেক্টর এর হাতে থানার দায়িত্বভার তুলে দেওয়া ।

চ. প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা ও সিসিটিভি ফুটেজ মুছে দেওয়ার চেষ্টা বিফলে যাওয়া ।

ছ . সঠিক পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট - সংশ্লিষ্ট ডাক্তার চিকিৎসকদের টাকা দিয়ে কেনা যায়নি ।

জ. উচ্চ আদালতের তদারকিতে সিবিআই তদন্ত, সুষ্ঠু তদন্ত শেষে চার্জশিট।

ঝ. সিবিআই কে দিয়ে সুবিধাজনক তদন্ত রিপোর্ট দেওয়া সম্ভব হয়নি।

ঞ. মৃতদের পরিবারের মুখ বন্ধ করা যায়নি ।

সব মিলিয়েই ব্যতিক্রম ঘটেছে।

এই রায় যারা হাজত হিংসা ও এনকাউন্টার ডেথের বিরুদ্ধে সুবিচারের জন্য যারা লড়ছেন তাদেরকে উৎসাহিত করবে।

মৃত্যুদণ্ড মানবাধিকার বিরোধী। তাই মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে আজীবন কারাবাস উপযুক্ত সাজা।

এই রায়ের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ হাইকোর্টে আপিল করার সুযোগ আছে। হাইকোর্টের পরে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। তাই হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না। সাজাপ্রাপ্ত পুলিশদের বাঁচাতে এবং সাজা লঘু করতে মাঠে নেমে পড়বে সাজাপ্রাপ্তদের সতীর্থরা। সতীর্থরা আছে সর্বত্র। বহাল তবীয়তে প্রচুর অর্থবল সামাজিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা নিয়ে। বাঘা বাঘা আইনজীবীদের নিয়োগ করা হবে হাইকোর্টে ও সুপ্রিম কোর্ট। পর্বত উঁচু টাকা তোলা হবে। অন্যদিকে জয়রাম ও বেনিক্সের পরিবারকে লড়তে হবে ক্ষমতা ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। অর্থশক্তির বিপুলতার বিরুদ্ধে। তাদের পাশে থাকতে হবে মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে এবং অন্যান্যদের যারা পুলিশি বর্বরতা ও কাঠামোগত হিংসার অন্তর্গত হাজত হিংসা ও এনকাউন্টার ডেথের বিরুদ্ধে সুবিচারের জন্য লড়ছেন। আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ী, সর্বোচ্চ আদালত অব্দি সাজা বহাল থাকবে। মৃত্যুদণ্ড নয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

রাষ্ট্রীয় বীভৎসতা ও নিষ্ঠুরতা ক্রমশ চরম রূপ নিচ্ছে। ফ্যাসিবাদী শাসনে নিষ্ঠুরতা ও বীভৎসতাকে স্বাভাবিকতায় পর্যবসিত করা হয়। অভিযোগ উঠলেই অভিযুক্তের চৌদ্দ পুরুষের ভিটে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। অভিযোগ প্রমাণের কোন প্রয়োজন নেই । আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বিচার প্রক্রিয়ার প্রয়োজন নেই। সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই । তদন্তের প্রয়োজন নেই। ন্যায়বিচার প্রক্রিয়ায় আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া অব্দি অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ। এই অলংঘনীয় প্রতিপাদ্য এখন শুধুমাত্র কলাপাতা। বুলডোজার জাস্টিসের যুগে। রাষ্ট্রীয় নিষ্ঠুরতা কতটা কর্কশতায় পৌঁছেছে তা জরিপ করা যায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সাম্প্রতিক একটি সুপারিশে। দ্যা হিন্দু সহ বিভিন্ন সর্বভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে যেখানে কাঁটাতারের বেড়া নেই বা দেওয়া সম্ভব নয় সেখানে কুমির ও বিষাক্ত সাপ ব্যবহার নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে বিএসএফ। অর্থাৎ সীমান্তে কুমির ও বিষাক্ত সাপ চাষ করা হবে , সীমান্ত সংলগ্ন জলাশয় এবং নদীতে কুমির এবং বিষাক্ত সাপ ছেড়ে দেওয়া হবে। কুমির এবং বিষাক্ত সাপ কি শুধু দেখে দেখে অনুপ্রবেশকারীদের ধরবে নাকি যাকে পাবে তাকেই খাবে এবং দংশন করবে। অনুপ্রবেশকারীদের কুমিরের মুখে ঠেলে দেওয়া বা বিষাক্ত সাপের ছোবল খাওয়ানো কি

আদিম হিংস্রতা ও বর্বরতাকেও হার মানায় না। এখন হিংস্রতাকে স্বাভাবিক জলভাত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। লকডাউন এর সময় সারাদেশেই পুলিশ প্রকাশ্যেই এবং অন ক্যামেরায় কোথাও নিরীহ নাগরিকদের বেধড়ক পিটিয়েছে, কোথাও লকডাউন অমান্য করার অভিযোগে নাগরিকদের প্রকাশ্যে নীলডাউন করিয়েছে ,চড় মেরেছে, পরিযায়ী শ্রমিকদের বিষাক্ত কীটনাশক দিয়ে স্প্রে করে 'শুদ্ধ' করেছে। সবগুলো ঘটনাই সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া দেখিয়েছে। তারপরও কোন আদালত একটি ঘটনা নিয়েও স্বত: প্রণোদিত মামলা নিয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ত্রিপুরা রাজ্যেও লকডাউনের সময় পুলিশি অত্যাচার ও বর্বরতার বহু ঘটনা ঘটেছে । একটি ক্ষেত্রেও বিচার হয়নি। জেলাশাসকরা ডান্ডা হাতে নিরীহ নাগরিকদের পিটিয়েছেন সারাদেশে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ নিষ্ঠুরতাই স্বাভাবিক , পুলিশি নিগ্রহ স্বাভাবিক। জেলাশাসকরা মারবেন অন্যায়ের কিছু নেই, এটাই তো স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক কে স্বাভাবিক করাই ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য। নাগরিককে প্রজা বানানো , অধিকারকে দয়া বা অনুদান হিসেবে খাড়া করানো। সংবিধান ও আইনের শাসনকে বাক্সবন্দী করে রাখা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রেক্ষাপটে তুতিকোরিনের অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের রায় এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

রাষ্ট্রের ছাড়পত্র ছাড়া পরিচয় নেই: ট্রান্সজেন্ডার সংশোধনী আইন ২০২৬ এবং অধিকারের অবক্ষয়

- নিজস্ব প্রতিবেদন

২০১৪ সালে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত একটি ঐতিহাসিক রায় দিয়েছিল। *National Legal Services Authority v. Union of India* — সংক্ষেপে NALSA মামলায় — সুপ্রিমকোর্ট ঘোষণা করেছিল যে লিঙ্গ পরিচয় ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্তের বিষয়। কোনো অস্ত্রোপচার নয়, কোনো চিকিৎসা পরীক্ষা নয়, রাষ্ট্রের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই — একজন মানুষ যে পরিচয়ে নিজেকে চেনেন, সেটাই তাঁর আইনগত পরিচয়। বিচারপতিকে এস. রাধা কৃষ্ণন লিখেছিলেন, *"Article 21 protects one's right of self- determination of the gender to which a person belongs."* এই রায় কেবল আইনি দলিল ছিল না — এটি ছিল লক্ষ লক্ষ ট্রান্সজেন্ডার মানুষের অস্তিত্বের স্বীকৃতি। সেই স্বীকৃতি আজ কার্যত বাতিল।

২০২৬ সালের মার্চ মাসে ভারতের সংসদে Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026 পাস হয় । লোকসভায় ২৪ শে মার্চ এবং রাজ্যসভায় ২৫ শে মার্চ বিলটি পাস হয়, এবং ৩০মার্চ রাষ্ট্রপতির সম্মতি পায়। বিলটি পাস হয়েছে ভয়েস ভোটে — বিরোধী দলের সদস্যরা প্রতিবাদে ওয়াক আউট করেছেন । যে আইনের নামে "সুরক্ষা" শব্দটি রয়েছে, সেই আইনই এখন ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের দশকের লড়াইকে ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে।

২০১৯ সালের মূল আইনে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির সংজ্ঞায় ট্রান্স-পুরুষ, ট্রান্স-নারী এবং জেন্ডার-কুইয়ার ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল — অস্ত্রোপচার বা হরমোন থেরাপি নির্বিশেষে। ২০২৬ সালের সংশোধনী বিল সেই সংজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দিয়েছে। ট্রান্স-পুরুষ, ট্রান্স-নারী এবং জেন্ডার-কুইয়ার — এই বিভাগগুলি আইন থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। এখন যাঁরা আইনি স্বীকৃতি পাবেন, তাঁরা মূলত কিন্নর, হিজড়া, অরভানি, জোগতা — অর্থাৎ ঐতিহাসিক ভাবে স্বীকৃত সামাজিক-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী।এর ফলে যাঁরা নিজেদের ট্রান্স-পুরুষ, ট্রান্স- নারী বা নন-বাইনারি হিসেবে চেনেন, তাঁরা আইনি স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

NALSA রায়ের সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ অর্জন ছিল স্ব-পরিচয়ের অধিকার। সংশোধনী বিল সেই অধিকার বাতিল করে একটি মেডিকেল বোর্ডের ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করেছে। এখন একজন ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিকে তাঁর পরিচয় প্রমাণ করতে হবে একটি মেডিকেল বোর্ডের কাছে, যার সুপারিশের ভিত্তিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সার্টিফিকেট দেবেন। এই পরিবর্তন লিঙ্গ পরিচয়কে

ব্যক্তিগত স্বায়ত্ত শাসনের প্রশ্ন থেকে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত চিকিৎসা ও জৈবিক মানদণ্ডের প্রশ্নে পরিণত করেছে।

এটি কেবল আমলা তান্ত্রিক জটিলতা নয়। এটি নীতিগত। সুপ্রিমকোর্ট ২০১৪ সালে স্পষ্ট করেছিল যে লিঙ্গ পরিচয় মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন, জৈবিক নয়। সেই অবস্থান থেকে রাষ্ট্র এখন পিছিয়ে এসেছে।

NALSA মামলায় সুপ্রিম কোর্ট তিনটি মৌলিক অধিকারের উপর ভিত্তি করে রায় দিয়েছিল — সমতার অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৪), বৈষম্যহীনতার অধিকার (অনুচ্ছেদ১৫) এবং জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার (অনুচ্ছেদ ২১)। বিচারপতি রাধাকৃষ্ণন স্পষ্ট লিখেছিলেন যে লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারণে "Biological Test"- এর পরিবর্তে "Psychological Test" গ্রহণ যোগ্য। ২০২৬ সালের সংশোধনী ঠিক সেই জৈবিক ও চিকিৎসা- নির্ভর মানদণ্ডকে ফিরিয়ে এনেছে যা সর্বোচ্চ আদালত প্রত্যাখ্যান করেছিল।

সংসদে বিল পেশ হওয়ার পর থেকে প্রতিরোধ স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। দিল্লি, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, ভুবনেশ্বর, হায়দ্রাবাদ — দেশজুড়ে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে । সোশ্যাল মিডিয়ায় #Reject Trans Bill 2026 হ্যাশ ট্যাগ ছড়িয়ে পড়েছে।

এই সংশোধনীর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র একটি স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে: তোমার পরিচয় তোমার নিজের নয়। তোমার পরিচয় রাষ্ট্রের অনুমোদন সাপেক্ষ। এই আইন কেবল আমলাতান্ত্রিক অতিক্রমণ নয়; এটি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির একটি মৌলিক পরিবর্তন। পরিচয় এখন আর অন্তর্নিহিত কিছু নয় — এটি যাচাই করা, সার্টিফাই করা এবং নিয়ন্ত্রণ করার বিষয় হয়ে উঠেছে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন বলে যে আইনি লিঙ্গ স্বীকৃতি হওয়া উচিত দ্রুত, সহজলভ্য এবং ব্যক্তির স্ব-নির্ধারণের ভিত্তিতে । ভারত এখন ঠিক বিপরীত পথে হাঁটছে। আইন পিছু হাঁটলে মানুষকে এগোতে হয়।

ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায় ভারতে কয়েক দশকের সামাজিক অবহেলা, পারিবারিক প্রত্যাখ্যান এবং রাষ্ট্রীয় উদাসীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছেন। ২০১৪ সালের NALSA রায় সেই লড়াইয়ের একটি মাইল ফলক ছিল। ২০১৯ সালের আইন অসম্পূর্ণ হলেও একটি আইনি কাঠামো দিয়েছিল।

২০২৬ সালের সংশোধনী সেই ইতিহাসকে অস্বীকার করছে। যে মানুষটি বছরের পর বছর ধরে নিজেকে চিনেছেন, তাঁকে এখন বলা হচ্ছে – আগে মেডিকেল বোর্ডকে প্রমাণ করো। এটি কোনো সুরক্ষা নয়, এটি নজরদারি।

মানবাধিকার বার্তা-র পাঠকদের কাছে আমাদের আবেদন: এই আইনকে নিছক দিল্লির সংসদীয় ঘটনা মনে করবেন না। এটি এমন একটি নজির যা ভবিষ্যতে যেকোনো সম্প্রদায়ের অধিকার খর্ব করার হাতিয়ার হতে পারে । আইনি লড়াই চলবে আদালতে – কিন্তু সামাজিক প্রতিরোধ গড়তে হবে সমাজেই।

টি এইচ আর ও ষষ্ঠ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন।

ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন (টি এইচ আর ও) ষষ্ঠ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ আগরতলা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ২০১৫ সনের পঞ্চম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তারপর বিভিন্ন কারণে সম্মেলন অনুষ্ঠিত করা যায়নি। প্রতিকূল পরিস্থিতি ও সাংগঠনিক দুর্বলতা জনিত কারণে। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর মানবাধিকারের পরিস্থিতির ভয়ানক অবনমন ঘটেছে। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েও টি এইচ আর ও দায়িত্ব পালন করতে সচেষ্ট ছিল।

ষষ্ঠ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সম্পাদক শ্রী পুরুষোত্তম রায় বর্মন, সাফল্যের পাশাপাশি দুর্বলতার কেন্দ্র গুলোকে নির্দিষ্ট করা হয়। প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন ২০ জন প্রতিনিধি। সম্মেলন নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ও কার্যকরী কমিটি নির্বাচন করেছে। সভাপতি তরুণ চক্রবর্তী ও সম্পাদক পুরুষোত্তম রায় বর্মন, সহ সভাপতি নিখিল দত্ত, নিবেদিতা দেববর্মা, ডঃ প্রশান্ত চক্রবর্তী। সহ-সম্পাদক দুজন কৌশিক নাথ ও আশীষ মুখার্জি । কোষাধক্ষ্য তুষার দেবনাথ।

রক্তচক্ষু

সাংবাদিকরা যে কথা বুঝতে বাধ্য হয়েছেন, এ বার সাধারণ নাগরিকদেরও একই কথা শিখে নিতে হবে- কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করলেও বিপদ। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক ইনফর্মেশন টেকনোলজি (ইন্টারমিডিয়ারি গাইডলাইনস অ্যান্ড ডিজিটাল মিডিয়া এথিক্স কোড) সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট রুল ২০২৬-এর যে খসড়া প্রকাশ করেছে, তাতে স্পষ্ট যে, বিরুদ্ধ স্বর দমনের পথে আরও প্রবল ভাবে চলতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২৪ সালেও সরকার স্বাধীন ডিজিটাল নির্মাতা এবং অনলাইন কনটেন্টের উপরে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করেছিল; সে দফায় প্রবল জনমতের চাপে শেষ অবধি পিছু হটতে হয় সরকারকে। বর্তমান খসড়া বিল আরও এক বার সেই একই চেষ্টা করছে। 'প্রকাশক নন' এমন ব্যক্তিবিশেষের অনলাইন মতামতকে রাষ্ট্রীয় নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে আসতে উদ্যোগী এই বিল। গত কয়েক বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সমালোচনামূলক অথবা ব্যঙ্গাত্মক কনটেন্ট সরিয়ে দেওয়ার একাধিক নজির আছে। নাগরিক সমাজের মুখ থেকে অসরকারি সংস্থা বা স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান- সরকারের সামান্য সমালোচনা করার ফলে রাষ্ট্রীয় রোষের শিকার হয়েছেন অনেকেই। এ বার এই মুখ বন্ধ করানোর প্রক্রিয়াটিকে আরও বেশি আইনি, আরও কাঠামোগত করে তোলার উদ্যোগ। এই খসড়া বিল যে ভঙ্গিতে ব্যক্তিনাগরিককে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে, গোটা গণতান্ত্রিক বিশ্বে তা ব্যতিক্রমী- বৈশ্বিক স্তরে কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ সাধারণত প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়; সরাসরি ব্যক্তিগত নির্মাতাকে ব্লকিং অর্ডার পাঠানো, ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা, বা কনটেন্ট পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়া অত্যন্ত বিরল। স্পষ্ট বলা প্রয়োজন যে, ভুয়ো তথ্য, ডিপফেক বা বিভ্রান্তিকর প্রচার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে; কিন্তু সেই যুক্তিকে সামনে রেখে নাগরিক-কণ্ঠ দমন করা নিতান্ত একাধিপত্যবাদ।

অর্থনীতির যুক্তি কেন্দ্রীয় সরকার বিলক্ষণ বোঝে। জানে যে, অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলির ব্যবসার উপরে চাপ তৈরি করতে পারলে তারাই স্বপ্রবৃত্ত হয়ে সরকার-বিরোধী গণতান্ত্রিক স্বর দমনের কাজ করবে। ফলে খসড়া বিল অনুসারে, ব্যক্তির মতামতের দায় বর্তাবে সংশ্লিষ্ট অনলাইন প্ল্যাটফর্মের উপরেও। ৩৬ ঘণ্টার বদলে তিন ঘণ্টার মধ্যে সরকার-নির্দিষ্ট কনটেন্ট অপসারণের বাধ্যবাধকতা, 'অ্যাডভাইজ়রি'-কে কার্যত আইনি নির্দেশে পরিণত করা, 'সেফ হারবার' সুরক্ষাকে রাষ্ট্রীয় নির্দেশ-মান্যতার সঙ্গে যুক্ত করা- স্পষ্টতই সরকার অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলির উপরে এমন চাপ তৈরি করতে চায়, যাতে তারাই গণতান্ত্রিক মত দমনের যন্ত্র হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞতা বলছে, সরকারের এই পদক্ষেপ ঘৃণাভাষণ

বা বিদ্বেষদমনে বিন্দুমাত্র সহায়ক হবে না। কারণ, গত কয়েক বছরে স্পষ্ট যে, শাসক দলের পক্ষে যারা সমাজমাধ্যমে ঘৃণা ছড়ায়, তাদের অন্যায় সরকারের চোখে পড়ে না। এই নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র বিরোধী স্বরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, নাগরিকের এমন আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেওয়ার কোনও অবকাশ নেই।

সে কারণেই, বিষয়টি শুধুমাত্র 'ডিজিটাল ক্রিয়েটর'-দের প্রভাবিত করবে না, তা সমগ্র ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করা, প্রশাসনিক ক্ষমতার মাধ্যমে সমালোচনামূলক কণ্ঠকে স্তব্ধ করার চেষ্টা- কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের এই রূপ কোনও নাগরিকের পক্ষেই ইতিবাচক হতে পারে না। এমনকি, বর্তমান রাষ্ট্রক্ষমতার প্রবলতম সমর্থকের পক্ষেও নয়। সব নাগরিক সব সময় রাষ্ট্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার মতো অবস্থায় থাকেন না। যাঁরা সেই কাজটি করেন, তাঁরা আসলে সব নাগরিকের জন্যই রাষ্ট্রের চোখে চোখ রাখার সাহস দেখান। তাই, এই দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা রাজনৈতিক মত-নির্বিশেষে নাগরিক কর্তব্য। এক বার নাগরিক স্বাধীনতার পরিসর সঙ্কুচিত হলে তাকে পুনরুদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন, অসম্ভবও বলা চলে।

ত্রিপুরা হিউম্যান রাইট্স অর্গানাইজেশন-এর কর্মসূচি

সৌভ্রাতৃত্বের পরিমণ্ডলে প্রত্যেকটি ব্যক্তির স্বাধীন, মর্যাদাময় ও পরিপূর্ণ জীবনের অর্জনের লক্ষ্যে ত্রিপুরা হিউম্যান রাইট্স অর্গানাইজেশন-এর লক্ষ্য-

ক) ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে জনচেতনা গড়ে তোলা-সহ বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ। ভারতের সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিসমূহকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে জনচেতনা গড়া ও কার্যক্রম গ্রহণ। সুষম, স্থিতিশীল ও মানবিক উন্নয়ন-এর লক্ষ্যে জনচেতনা গড়া-সহ বিবিধ কার্যক্রম গঠন।

খ) প্রাকৃতিক সম্পদ, বৈষয়িক সম্পদসহ সমস্ত সম্পদে সবার সমানাধিকার সুনিশ্চিত করার সপক্ষে এবং সম্পদের কেন্দ্রীভবনের বিরুদ্ধে জনচেতনা গড়ে তোলা-সহ বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ।

গ) যেকোন ধরনের অসহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িকতা, জাতি-বর্ণ-নিপীড়ন, নারী অবদমন, ধর্মীয় মৌলবাদ, যুদ্ধোন্মাদনা ইত্যাদির বিরুদ্ধে জনমত গঠন ও বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ।

ত্রিপুরা হিউম্যান রাইট্স অর্গানাইজেশন-এর গঠনতন্ত্র

১। সংগঠনের নামঃ ত্রিপুরা হিউম্যান রাইট্স অর্গানাইজেশন। সংক্ষেপেঃ টি.এইচ.আর.ও

২। সংগঠনের কর্মসূতী ও গঠনতন্ত্র মেনে যারা সংগঠনের কাজ করতে আগ্রহী তারাই সদস্য হতে পারবেন। সদস্যদের নূন্যতম বয়স ১৮ হতে হবে। রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন না।

৩। বার্ষিক সদস্য চাঁদা = ১০০ টাকা

বার্ষিক সদস্য চাঁদা নিম্নহারে বন্টিত হবেঃ

বিভাগীয় কমিটি = ৩০%

জেলা কমিটি = ২০%

কেন্দ্রীয় কমিটি = ৫০%

৪। সংগঠনের কাঠামো (ক) কেন্দ্রীয় কমিটি। (খ) জেলা কমিটি (গ) বিভাগীয় কমিটি।

৫। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ৪৭। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা ১৩ জনের কার্যকরী কমিটি গঠন করবেন। কেন্দ্রীয় কমিটিতে ১জন সভাপতি, ৩জন সহ-সভাপতি, ১জন সম্পাদক, ২জন সহ-সম্পাদক, ১জন কোষাধ্যক্ষ, ১জন দপ্তর সম্পাদক থাকবেন।

জেলা কমিটির সর্বোচ্চ সংখ্যা হবে ১৩। জেলা কমিটিতে ১জন সভাপতি, ১জন সহ-সভাপতি, ১জন সম্পাদক, ১জন কোষাধ্যক্ষ, ১জন দপ্তর সম্পাদক থাকবেন।

বিভাগীয় কমিটিতে সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা হবে ১৯। বিভাগীয় কমিটিতে ১জন সভাপতি, ২জন সহ-সভাপতি, ১জন সম্পাদক, ১জন সহ-সম্পাদক, ১জন কোষাধ্যক্ষ, ১জন দপ্তর সম্পাদক থাকবেন।

৬। প্রতি দুই বছর অন্তর কেন্দ্রীয় সম্মেলন, জেলা সম্মেলন ও বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিটি কমিটি নির্বাচিত হবে।

৭। প্রতিটি কমিটির কোরাম হবে মোট সদস্য ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) উপস্থিতি।

৮। সংগঠনের পতাকা হবে সাদা কাপড়ের উপর সংগঠনের লোগো। পতাকার দৈর্ঘ্য হবে প্রস্থের দেড়গুণ। শৃংখল মুক্ত দুই হাতের নীচে পৃথিবী। নীচে লেখা থাকবেঃ Tripura Human Rights Organisation. এই হবে সংগঠনের লোগো। লোগোর রঙ হবে নীল। আকাশী নয়।

৯। সংগঠন বিরোধী ভূমিকা এবং নৈতিক অধঃপতনের জন্য যেকোন সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে বহিস্কার করার এক্তিয়ার কেন্দ্রীয় কমিটির থাকবে।

দুর্গা চৌমুহনী বিপনিবিতান ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন কর্তৃক থেকে প্রকাশিত
সম্পাদক পুরুষোত্তম রায় বর্মন